তোমার জন্য

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট. কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সাহিত্য প্রকাশ প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬ : মে ১৯৫৯

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর : ভোলানাথ পাল : তনুশ্রী প্রিন্টার্স

৪/১ই, বিডন রো : কলিকাতা-৬

দুলাল ও ঝুনুকে

: আমাদের প্রকাশিত লেখকের বই :

এত নির্জনে গা ছমছম করার কথা সোমা গাঙ্গুলির। কিন্তু তা করছে না। উল্টে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে চোখে মুখে মাথায়। বাতাসে গাছের পাতার সড়সড় শব্দটুকুও চমকে উঠার মতো। দুদিকে ঘন গাছ-গাছড়া, মাঝখানে পাকা রাস্তা। ঠিক কোন্ জায়গায় এসে গাড়িটা বিকল হয়েছে ঠাওর করা যাচ্ছে না।

বিজন পথ ধরে চলতে চলতে গাড়িটা এখানে এসে হঠাৎ থেমেছে। নিজে থেকে থামেনি, থামানো হয়েছে। নিচের দিক থেকে ঘট্ ঘট্ শব্দ আসছিল একটা, শব্দটা বাড়ছিল। আর তাই শুনে পাশের লোকের ভুরুর মধ্যে ভাঁজ পড়ছিল। কিসের শব্দ, কেন শব্দ সোমা জানে না। গাড়ির মিকানিজম্ কিছু জানা নেই তার।

গাড়ি যে চালাচ্ছিল, অর্থাৎ পাশের লোকটা এখানে হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে নেমে গেছে। তারপর উপুড় হয়ে গাড়ির নিচে মাথা গলিয়ে দেখতে বা বুঝতে চেষ্টা করছে কি হল।···বুঝেছে বোধহয় কোথায় কি গণ্ডগোল হয়েছে। বেরিয়ে এসে পিছনের ক্যারিয়ারের ঢাকনা খুলে বড় রাবার শিটটা আর কিছু যন্ত্রপাতি বার করল। গাড়ির তলায় রাবার শিটটা বিছিয়ে যন্ত্রকটা হাতে নিয়ে নিজেও চিৎ হয়ে ঢুকে গেল। তারপরেই মেরামতের ঠুকঠাক শব্দ কানে আসতে লাগল।

আর সেই মুহূর্তে চোখে মুখে মাথায় ঝলকে ঝলকে তপ্ত রক্ত উঠে আসতে লাগল সোমা গাঙ্গুলির! সামনের ড্যাশ-বোর্ডে চাবিটা ঝুলছে। খুব নিঃশব্দেই একটি মোচড় পড়তে পারে ওটাতে তারপর যেটুকু সেটা চোখের পলকের ব্যাপার। মাথায় যা এসেছে তা করে ফেলার মতো এতবড় সুযোগ আর এমন পরিবেশ জীবনে পাবে না।

সন্তর্পণে নিজের পাশের জানালা দিয়ে সোমা গাঙ্গুলি নিচের দিকে গলা বাড়ালো। কিছু দেখা গেল না। দেখা যাক না যাক এইদিকে লোকটার মাথা—জানে। তেমনি নিঃশব্দে নিজেকে হিঁচড়ে নিয়ে গেল পাশের চালকের আসনে। আবার সেদিকের জানালায়

মাথা গলিয়ে ঝুঁকে দেখল।…এদিকে গাড়ির তলায় হাঁটুর নিচ থেকে পা পর্যন্ত বেরিয়ে আছে। লম্বা মানুষ, তাই থাকার কথা।

সোমা গাঙ্গুলি মাথা সরিয়ে নিল। হাতে আর কটা মুহূর্ত সময় আছে জানে না। সন্তর্পণে এন্‌জিনের চাবিটা ঘোরালো। তারপর মুহূর্তের মধ্যে সেই কাণ্ডটা করে ফেলল—ফেলতে লাগল।

…গর্জন তুলে গাড়িটা পাঁচ সাত হাত সামনে এগোচ্ছে আবার পাঁচ সাত হাত পিছিয়ে যাচ্ছে।

…আবার সামনে যাচ্ছে আবার পিছিয়ে আসছে।

…আবার। আবার আবার আবার।

প্রত্যেকবার একটা দেহ চাকার নিচে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পিষে পিষে যাচ্ছে টের পাচ্ছে। তবু থামছে না সোমা গাঙ্গুলি। থামার উপায় নেই। গাড়ির নিচের ওই দেহের হাড়গোড় মাংস চামড়া মাটির সঙ্গে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত এই করে যেতে হবে তাকে।

…গাড়িটা এখন থেমে আছে। চালকের আসনে বসে সোমা গাঙ্গুলি কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে। এবারে কি করবে? যা হবার তা হয়ে গেল—এখন? কোথায় পালাবে? কেমন করে পালাবে?

গাড়িটা নিয়ে পালাবার কোন প্রশ্ন নেই কারণ সোমা গাঙ্গুলি গাড়িই চালাতে জানে না…

কি আশ্চর্য! গাড়ি চালাতে জানে না তো এ-কাজটা সে করে উঠল কি করে? উপর্যুপরি ফরওয়ার্ড আর ব্যাকওয়ার্ড ড্রাইভিং…!

ধড়মড় করে উঠে বসল সোমা গাঙ্গুলি। না, বন-ভূমির কোন বিজন প্রান্তে নয় কোন গাড়িতেও নয়—সে তার বিছানায় বসে আছে। হাড়ে হাড়ে ঠক্‌ঠক্ কাঁপুনি এখনো। ঘামছে দরদর করে। পাশে ছেলে ঘুমুচ্ছে। গাড় ঘুমের ঘড়ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে তার নাক দিয়ে। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছে তাইতেও।

সত্যি নয় সোমা গাঙ্গুলি স্বপ্ন দেখেছে। তবু চোখের সামনে একটা তাজা মানুষের হাড়গোড় চামড়া মাংস বিধ্বস্ত মৃতদেহ চোখে ভাসছে

তার। অরবিন্দ—অরবিন্দ গাঙ্গুলির।। মশারির ভিতর থেকে বাইরের জানালার দিকে তাকালো। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। ভোরের আলোর আভাস জাগছে।···ভোর রাতের স্বপ্ন তাহলে। হ্যাঁ, দুনিয়ার ওই একটি মানুষের একেবারে শেষ দেখতে পেলে সোমার আপত্তি নেই। কিন্তু তা বলে স্বপ্নে যা দেখল তেমন কোন দুঃসাহসিক কাণ্ড করে ওঠার মতো বুকের পাটাও নেই। অথচ স্বপ্নের মধ্যে ঠিক পেরেছে—কদিন আগে বিলিতি ছবিতে যেমন দেখেছিল, হুবহু তেমনি পেরেছে।

গেল সপ্তাহে বরুণ চক্রবর্তীর পাশে বসে দেখে এসেছিল ওই নৃশংস ইংরেজি ছবিটা। স্বামীর অত্যাচারে হাড়মাস কালি এক শ্বেতাঙ্গ রমণী ঠিক ওইভাবে প্রতিশোধ নিয়েছিল আর শেষ পর্যন্ত তার মাশুলও দিয়েছিল। ছবির সেই প্রতিশোধের দৃশ্য দেখতে দেখতে বার বার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল সোমার। পাশ থেকে বরুণ চক্রবর্তী সেটা টের পেয়েছিল কিনা কে জানে। কিছু একটা ব্যতিক্রম অনুভব করছিল নিশ্চয় নইলে অন্ধকারে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল কেন ওর দিকে। ছবি শেষ হবার পরেও লালচে মুখ সোমার। বরুণ চক্রবর্তী ওকে একটা ভাল রেস্তোরায় বসিয়ে বেশ খাইয়েছিল তারপর। কিন্তু ছবির ওই বীভৎস দৃশ্যটা কিছুতেই মন থেকে সরছিল না সোমার। ছবির নায়িকা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠেছিল সে—একেবারে যেন একাত্ম হয়ে গেছল তার সঙ্গে।

···সোমার মধ্যেও যে একটা খুনী বাসা বেঁধে বসে আছে কে জানত! আছেই—নইলে হুবহু এ-রকম স্বপ্ন দেখে উঠল কি করে? ছবির নায়ক যত অকরুণ অত্যাচারীই হোক সে একটা পুরুষ মানুষ। ক্ষমাশূন্য নির্দয় পুরুষ। অরবিন্দ গাঙ্গুলি সেই রকম জোরদার পুরুষ হলেও ভিতরে ভিতরে এত নৃশংস হয়ে উঠত কি সোমা? বোধহয় না। এই লোক পুরুষ মানুষই না। কাপুরুষ—ঠক—প্রবঞ্চক ভাঁওতাবাজ। ভণ্ডামিতে ভুলিয়ে ওর জীবনটাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বর্ণশূন্য মরুভূমি করে দিয়েছে। এই কারণেই ছবির ওই নায়িকার থেকেও ঢের ঢের বেশি রাগ বুকের তলায় জমে

জমে পাথর হয়ে আছে। আর এই কারণেই যে মেয়ে নিজের হাতে একটা মশা-মাছি মারতে পারে না—সে এইরকম স্বপ্ন দেখেছে।

তবু বিচ্ছিরি একটা অস্বস্তিতে ভিতর ছেয়ে আছে। স্বপ্নে দেখা ওই গোছের কিছু একটা করে বসার মতো তপ্ত রক্ত মাথার দিকে উঠে আসতে চাইছে আবার প্রচণ্ড অস্বস্তিতে গা-ও কাঁপছে। ছেলের নাকের ঘড়ঘড়ানিও অসহ্য মনে হচ্ছে—স্বপ্নে শোনা গাড়ির এন্জিনের আওয়াজের মতো কানে লাগছে।

দুহাতে ঠেলে ছেলেকে ও-পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার এক ঝলক রক্ত উঠল মাথায়। বিছানা ভিজিয়ে একশা করেছে। ঘুমন্ত ছেলের পিছনে ঠাসঠাস দুটো চড় বসিয়ে দিল সোমা। ছেলেটা ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠল। দুহাতে সোমা ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে রাগে গজগজ করে উঠল, আবার কান্না হচ্ছে, খুন করে ফেলব তোকে আজ—যা সরে যা, সর—

সামনের ঘর থেকে বাবার বিরক্তি-মাখা গলা ভেসে এল, ভোর না হতে ছেলেটাকে মারধর শুরু করে দিলি, কি হয়েছে?

এ-ঘর থেকে বাবার ওপরেও মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, সোমা—খুব ওষুধ দিয়েছিলে কাল রাত্তিরে—বিছানাপত্র ভাসিয়ে দিয়েছে—পুরিয়া-টুরিয়া সব দূর করে ফেলে দিচ্ছি আমি!

সত্যেশ্বর অন্যথায় সত্য হালদার প্রায় রাত থাকতে শয্যা ছেড়ে ওঠেন। তার আগে শুয়ে শুয়ে মিনিট কতক ইষ্টনাম স্মরণ করে থাকেন। আজ তাতে ব্যাঘাত ঘটল। ভাল করে সকাল না হতে মেয়ের এই মেজাজ দেখে তাঁরও ভিতরটা তিরিক্ষি হয়ে উঠল। প্রায়ই বিছানা নষ্ট করছে বলে ছেলের জন্য সোমা ওষুধ চেয়েছিল। অব্যর্থ ওষুধই দিয়েছেন সত্য হালদার—নাতির ভেতর-বার সব জানা, ওষুধ অব্যর্থ না হবার কোন কারণ নেই। রাত্রিতে মেয়ের হাতে কটা পুরিয়া দিয়ে বলেছিলেন, রাতে সবার আগে একটা করে খাইয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোগে যা।

নিশ্চিন্তে ঘুমোনোর ফল এই। সকালের শুরুটাই খারাপ ভাবলেন

সত্য হালদার। তাই রেগে গেলেন তিনিও। রাগের আরও কারণ ইদানীং সর্ব ব্যাপারে মেয়ের সহিষ্ণুতার ঘাটতি দেখছেন তিনি। দুনিয়ার সক্কলে যেন তার কাছে দোষ করে বসে আছে। এখন আবার বাপের ওষুধের ওপর অশ্রদ্ধা।

শোয়া থেকে উঠে বসলেন সত্য হালদার। গলা চড়িয়ে বললেন ওষুধ ফেলে দিবি দে, পয়সা দিয়ে তো আর কিনতে হয়নি—গায়ে লাগবে কেন! আবার কখনো ওষুধ চাইতে এসে দেখিস আমার কাছে—একটা বাচ্চা ছেলেও জানে হোমিওপ্যাথি ওষুধে প্রথমে একটু বাড়ে তারপর কমে—তোর সবেতে একেবারে ম্যাজিক চাই—এত অধৈর্য বলেই এই দশা।

শেষের মন্তব্য রাগের মাথায় মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছে। মনে মনে প্রমাদ গুনলেন সত্য হালদার। কাক-ডাকা ভোরে এবারে এক দফা রাগারাগি কান্নাকাটির আশংকা, চৌকি ছেড়ে ভয়ে ভয়ে মাটিতে পা দিলেন তিনি।

বাবার শেষের খোঁচাটাও সোমার কানে বিঁধেছে ঠিকই। এই দশা বলতে কোন্ দশার খোঁটা দিল সেটা হাড়ে হাড়ে জানে। আর এই কারণেই এ ধরনের শ্লেষ মুখ বুজে হজম করে উঠতে পারে না। কিন্তু এত ভোরে সেই নৈমিত্তিক অশান্তির মধ্যে ভাজা-ভাজা হবার দিকে এগোতে মন চাইল না। আসলে স্বপ্নে ওরকম একটা কাণ্ড করে ওঠার ফলে স্নায়ুগুলো সব অবসন্ন হয়ে আছে এখনো। একটা তাজা দেহ চুরচুর হয়ে মাটির সঙ্গে মেশার দৃশ্যটা চোখ থেকে সরানো যাচ্ছে না। নিজের ভিতরের এমন বীভৎস হিংস্র রূপটা সোমার কল্পনার মধ্যে ছিল না।

সেই কারণেই অস্বস্তি। রাগলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না নিজেও। জানে। কখন কি যে করে বসে তার ঠিক কি? ভোরের স্বপ্নের কি ফল? বাবাকে খোলাখুলি সব বলতে পারলে পাঁজির দিনক্ষণ গ্রহ-নক্ষত্র দেখে বাবা হয়তো স্বপ্নের একটা শাস্ত্রগত ব্যাখ্যা সামনে তুলে ধরবে। কিন্তু বাবাকে বলার মতো স্বপ্ন নয় এটা। প্রতিহিংসায়

বিঁধিয়ে আছে ভিতর-বার, এ সোমা নিজেও অস্বীকার করে না। এই পৃথিবীতে কেবল একটা মাত্র মানুষের শেষ দেখতেই চায় সে। কিন্তু তা বলে এমন কিছু করতে চায় না যার ফলে নিজেই আবার নতুন কোন বিপাকের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে। তাতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ছেলেটা তাহলে ভেসেই যাবে।

হাত বাড়িয়ে ছেলেকে নিজের শুকনো জায়গায় টেনে নিয়ে এল। ওর পরনের প্যাণ্টটা টেনে খুলে মশারির বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঝুঁকে কচি মুখটা দেখল একবার। অন্য দিন হলে সোমা হেসেই ফেলত। এই টানা-হেঁচড়ার ফলে পাজীটার চোখের ত্রিসীমানায় ঘুম নেই আর—আবার রাগারাগি বকাবকির ভয়ে প্রাণপণে চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। কিন্তু আজ হাসির বদলে থমথমে মুখ সোমার। আবার দু ঘা বসিয়ে দিতে ইচ্ছা করল তার। রক্তের দোষ যাবে কোথায়? এটুকু ছেলেও এর মধ্যে ভান করতে শিখেছে। মিথ্যের মুখোশ আঁটতে শিখেছে। এই একটা চিন্তা মাথায় রোগের মতো চেপে বসছে। ছেলের ওই ছোট শরীরটার সমস্ত শিরা-উপশিরা থেকে বাপের রক্ত সরিয়ে ফেলার কোন সহজ উপায় থাকলে সোমা গাঙ্গুলি তাও করত বোধহয়।

মুখ হাত ধুতে গিয়ে একেবারে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে সোমা বাথরুম থেকে বেরুলো। বাথরুম বলতে চার দেয়ালের খুপরি একটুখানি। ওখানে কাপড় বদলাতে হলে শুকনো কাপড় আধখানা ভেজে। দিদিদের মধ্যে চেহারার জোরে আর খানিকটা নিজের কেরামতিতে মেজদির সব থেকে ভাল বিয়ে হয়েছে। মেজদির বাড়ির সব থেকে বেশি পছন্দ ওদের বাথরুম দুটো। শোবার ঘরের মতো ঝকঝকে টাইলের মেঝে, শাওয়ার বেসিন ছাড়াও আরো কত রকমের টুকিটাকি ব্যবস্থা। সোমার মনে মনে বাসনা ছিল ওইরকম একটা অনুরূপ বাথরুম তারও হয়। ওর বিয়ের আগে কিছু ছেলে বাবাকে জ্বালিয়েছে কারণ সোমা নিজেই জানে মেজদির মতো না হোক

চেহারা-পত্র তারও মন্দ নয়। গায়ের রংটা সে-রকম ফর্সা হলে মেজদির থেকেও সুন্দরী বলা যেত তাকে। তা সেইসব ছেলেগুলোর কারো কারো বাড়ির অবস্থা মন্দ ছিল না। সবকিছুর আগে সোমার খবর নিতে ইচ্ছে করত তাদের কার বাড়ির বাথরুম কি-রকম। হাসাহাসির ব্যাপারও হয়েছিল একবার। হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে সবে তখন বি-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে সোমা। ওই মেজদিই বেশ ভাল সম্বন্ধ এনেছিল একটা। তখনো বোনেরা কেউ জানে না বাবা কেন ছোট মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ কানে তোলেন না। সোমা প্রথমেই মেজদিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোদের বাড়ির মতো বাথরুম আছে তাদের ?

এই সংগোপন প্রশ্নটা মেজদি সকলের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল।

শুধু বাথরুম কেন ছোটখাট এমনি অনেক ব্যাপারেই সখ একটু বেশিই ছিল সোমার। তা সবই ভাল রকম মিটেছে। আগে সর্দির ধাত ছিল, একটু জল ঘাঁটাঘাঁটি করলে ঠাণ্ডা লাগত, ফ্যাঁচফ্যাঁচ হাঁচি হত। এখন সমস্ত দিন মাথাটা জলে ডুবিয়ে রাখলেও ঠাণ্ডা ধারে কাছে ঘেঁসে না।

মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। স্নানের পর ভাল লাগছে। ওদিকে চায়ের আশায় বসে বসে বাবার মেজাজ চড়ছে বোধহয়। চড়ুক। সাহায্যের জন্য একটা বাড়তি লোক রাখার নাম নেই। বললেই তাঁর সাফ জবাব, আড়াইজন লোকের জন্য আবার বাড়তি লোক রেখে কি হবে—ঘর ঝাঁটপাট আর বাসন মাজা বাঁটনা বাটার লোক তো আছেই একজন। পারলে বাবা এই একজনকেও ছাড়ায়। কারণ ওই আড়াইজন লোকের মধ্যে দেড়জন হল সোমা আর তার ছেলে। যে মেয়েছেলেটা আছে তার মাইনেও সোমাই দেয় কিন্তু এখানে একবেলা খায় যে সেটাই বাবার লোকসান।

ভিজে জামা-কাপড়গুলো চটপট তারে মেলে দিয়ে সোমা মাথাটা আঁচড়ে নেবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল। স্নানের পর বেশ করে মাথাটা না আঁচড়ে নিয়ে সে কোন কাজে মন দিতে পারে না। আড় চোখে শয্যার দিকে তাকালো একবার। ছেলেটা আবার ঘুমিয়ে

পড়েছে বোধহয়। পাশের ঘরে উঁকি দিল। বাবা নেই—অর্থাৎ দপ্তর খুলে বসেছে। অর্থাৎ তারও মেজাজ প্রসন্ন নয় এটুকুই বোঝাতে চায়। সাধারণত এ-ঘরে খুনসুটি করে বাবাই ছেলের ঘুম ভাঙায়, মুখ হাত ধোয়ার জন্য তাকে ঠেলে পাঠায়। তারপর চায়ের পর্ব সেরে দপ্তরে গিয়ে বসে। এত সকালে রোগীপত্তর কেউ আসবে না—সমস্ত দিন আর রাতের মধ্যে কটা রোগীই বা আসে। লোকের বিশ্বাস ভাঁটার দিকে গড়াচ্ছে এখন। চা না খেয়ে এরই মধ্যে দপ্তরে গিয়ে বসার মানে রাগ ছাড়া আর কি ?

করুক রাগ। সোমা এখন আর কারো রাগ-বিরাগের ধার ধারে না। ছোট ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ভিজে চুলের বোঝায় মোটা চিরুনি চালাচ্ছে। এ-ঘরের এই খাট, ড্রেসিং টেবিল, বসার কুশন সবই ওর নিজের। বিয়ের সময় বাবার দেওয়া। সাত বছর হল বিয়ে হয়েছে, এগুলো আর এখান থেকে নড়েনি। শরীরের রক্ত আবার তেতে উঠছে সোমার, স্বপ্নের কথা মনে পড়ছে। অসহিষ্ণু হাতে আরো জোরে চিরুনি চালাবার ফলে মট করে ওটা ভেঙে দু আধখানা। অর্ধেক তার হাতে বাকি অর্ধেক পিছনের চুলের গোছায়।

বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে আয়নার ভিতর দিয়ে নিজেকেই একটা ভেংচি কেটে উঠল সোমা। একদিন এই চুলের বোঝাই ছিল ওর সব থেকে বেশি গর্বের বস্তু। ছেড়ে দিলে পিছন দিকের হাঁটুর কাছাকাছি নেমে আসে।···এই চুল বড় পছন্দ একজনের, সেই রাগে গোড়ায় গোড়ায় কত দিন হাত নিশপিশ করেছে, সোমার ইচ্ছে হয়েছে একটা কাঁচি নিয়ে মাঝখান দিয়ে কচ-কচ করে কেটে ফেলে। না, নিজের এতবড় ক্ষতি করে ফেলার মতো অতটা রাগ এখন আর হয় না। হয় না কারণ পুরুষ মানুষের বাসনার নিগূঢ় দৃষ্টিটা তার চেনা হয়ে গেছে। হাতের সম্বল হাতে থাকা ভাল। এই রিক্ত জীবন সে আর খুব বেশি দিন বরদাস্ত করবে না সেটা একরকম ঠিকই করে ফেলেছে।

হাতের আধখানা চিরুনি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চুলে

আটকানো বাকি আধখানা নিয়ে কাজ সারতে লাগল। সিঁদুরশূন্য ফাঁকা কপাল একটু বেশি চওড়া দেখায় আর সিঁথিটাও কেমন খরখরে সাদাটে মনে হয়। বছর তিনেক আগে পর্যন্ত বেশ যত্ন করে সিঁদুরের টিপ পরত, একটু মোটা করে সিঁথি রাঙাতো। আসলে তাতে নিজের কাছে নিজেকে একটু বেশি সুন্দর লাগত। কিন্তু একজনের শেষ আশাটুকুও নির্মূল করার তাড়নায় সিঁদুর বাতিল করেছে। যে মেয়ে এতটা পারে সে যে অনেকটাই পারে সেটা একজনকে খুব ভাল করে বোঝাতে পেরেছে। কপাল আর সিঁথি সাদা দেখে স্কুলের এয়ো সহ-শিক্ষয়িত্রীদের এখনো চোখ কটকট করে। আড়ালে-আবডালে কত সময় কত কথা বলে তারা, সোমা তাও ঠিক বুঝতে পারে। তাছাড়া চুপিচুপি নমিতাদিও সতীর্থদের টীকাটিপ্পনীর কথা ওর কানে তুলে দেয়। নমিতাদিকে কোন টিচার দুচক্ষে দেখতে পারে না। যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব তার। বয়সে বছর খানেকের বড় হবে সোমার থেকে। বলতে গেলে প্রায় একই দশা দুজনের। দশ বছর হয়ে গেল নমিতাদিরও স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তার স্বামীটা লম্পট এক নম্বরের। সিনেমার রাজ্যে ঘোরে, পাঁচ রকমের মেয়ে নিয়ে কারবার তার—নমিতাদিকে মনে ধরবে কেন?

···কিন্তু নমিতাদি সিঁথির আর কপালের সিঁদুর ঘোচায়নি। তার সহজ কারণও সোমা অনুমান করতে পারে। ওটুকু না থাকলে দেখতে আরো বিচ্ছিরি হবে। তাছাড়া জীবনে কোন পুরুষ মানুষ আসেনি এও হয়তো নমিতাদি কাউকে বুঝতে দিতে চায় না। কিন্তু সোমা সিঁদুর মুছে ফেলতে ওই নমিতাদিই মনে মনে সব থেকে খুশী সেটুকু আঁচ করার মতো বুদ্ধি সোমার আছে। কারণ, যে একজনকে সে জীবন থেকে বাতিল করেছে সেই একজনকে নমিতাদির তলায় তলায় বেশ পছন্দ। পছন্দের মাত্রা ইদানীং বেড়েই চলেছে মনে হয়। সোমা কিছুই না জানা না বোঝার ভান করে থাকে। আর ওই লোকের বিরুদ্ধে নমিতাদিকে একটি কথাও বলে না। মজুক, মজুক, খুব ভাল করে মজুক—আর তারপর কত বড় অপদার্থ মানুষের খপ্পরে পড়েছে

জেনে ওর মতোই জ্বলে-পুড়ে খাঁক হয়ে যাক।

অত চুলের গোছা আধখানা চিরুনি দিয়ে বশে আনার চেষ্টায় ওরও শরীরের ওপরের আধখানা পিছন দিকে বেঁকে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন নিজের দিকেই চোখ গেল সোমার। সুন্দরই লাগছে। বুকের একদিকের কাপড় সরে সরে যাচ্ছে। তার ফাঁকে ফাঁকে ব্লাউসের ওপর দিয়ে নিটোল যে বস্তুটি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে সেদিকে চোখ পড়তেই একটা তিক্ত স্মৃতি মনে ভেসে এল···কিন্তু সেদিনের সেই স্মৃতি আর যাই হোক তিক্ত ছিল না মোটেই। সর্বাঙ্গে বরং একটা অননুভূত কাঁপুনির সাড়া জেগেছিল। আর রাগে জ্বলে উঠতে চেষ্টা করেও যে তাপটুকু অনুভব করেছিল তাতে শুধু রোমাঞ্চ ভিন্ন আর কোনরকম জ্বলুনি ছিল না।

···সামনে তখন এই ড্রেসিং টেবিল ছিল না, ওই দেয়ালে তখন মাঝারি সাইজের আয়না ঝুলত একটা। সে-ছিল এক সরস্বতী পুজোর দিন। খুব ভোরে স্নান সেরে পরনের শাড়িটা শুধু গায়ে জড়িয়ে মাথা আঁচড়ে নিচ্ছিল সোমা। সোমা গাঙ্গুলি নয় তখন, সোমা হালদার। মাথা আঁচড়ে দিদির আসার আগেই পুজোর সাজু-টাজু সেরে রাখার ইচ্ছে।

···সেদিনও কেন যেন আধখানা চিরুনি ছিল হাতে। মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে শরীরের ওপরের দিকটা এই রকমই বেঁকে যাচ্ছিল। কিন্তু সেদিন ছিল আদুড় গায়ে শাড়ির আঁচল জড়ানো। সেই আঁচল সরে যেতে একদিকের যে বস্তুটি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল সোমা নিজেই সেদিকে লোভীর মতো তাকাচ্ছিল আর মিটিমিটি হাসছিল। কারো এসে পড়ার ভয় নেই এই সকালে, পাড়ার আর ঘরের দু-দুটো পুজো সারতে হবে বলে বাবা সেদিন সরকারদের বড় পুকুরে চান করতে গেছে। তাছাড়া পিছনের দরজা দুটোও ভেজানো।

নিজের দিকে চেয়ে বেশ মজাই লাগছিল সোমার। হাসি-হাসি মুখে আরো বেশি বেঁকে-চুরে পিছনের চুলের বোঝা পাট করছিল—হাসি-মাখা চোখ দুটো নিজের বুকের ওপর।

···হঠাৎ বিষম চমকের ফলে অস্ফুট একটা আর্তনাদই বেরিয়ে

এসেছিল নিজের গলা দিয়ে। কিন্তু বিপর্যয় যেটুকু ঘটার তার আগেই ঘটে গেছল। তখনো চিরুনিশুদ্ধ দুই হাত মাথার পিছনে, শাড়ির ডাইনের আঁচল স্থানচ্যুত। আয়নায় চোখ পড়তে সেই অবস্থাতেই বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। ঠিক দেখছে কি দেখছে না তাও বুঝছে না যেন।···আয়নায় দেখছে পিছনের ভেজানো দরজা আধ হাত ফাঁক, আর সেই ফাঁক দিয়ে একখানা আত্মবিস্মৃত মুখ।

কয়েক পলকের চোখাচোখি, তারপরেই হাতের চিরুনি ছুঁড়ে ফেলে সোমা পড়িমরি করে ঘরের অন্য কোণে আড়াল নিয়েছিল। বুকের তলায় ঠক-ঠক কাঁপুনি। শাড়ির আঁচলটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বে-আবরু লাগছিল নিজেকে। সমস্ত মুখ টকটকে লাল।

বাইরে থেকে একটা আবেদন কানে এসেছে, ভিতরে আসব ?

—না না না ! দিশেহারার মতো ছুটে গিয়ে একটা ব্লাউস টেনে বিছানার ঠিকির পিছনে দাঁড়িয়ে সোমা চোখের পলকে পরে নিয়েছে। তখনো কাঁপুনি যায়নি, আর তখনো চট করে এসে দরজা খোলা যায়নি।

একটু বাদে দরজা খুলে দেখে এক ঝুড়ি গাঁদা-ফুল হাতে লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, ওই মূর্তি দেখেই মুহূর্তের জন্য রেগে উঠতে পেরেছিল বটে সোমা।—এত সকালে আপনার ফুল নিয়ে আসার কি দরকার পড়েছিল—আর এনেছেনই যদি দরজা না ঠেলে বাইরে থেকে ডাকেন নি কেন ?

মুখের দিকে চেয়েই লোকটা যেন কেমন এক তন্ময়তার গভীর থেকে উঠে এসেছিল। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, আমার কপাল মন্দ, সাধ করে কে আর এমন বিপদ ডেকে আনে।

জবাব শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছল সোমা। তখনো ছোটটি নয় একটুও। বি-এ পাশ করে উঠেছে। বয়স তেইশ গড়িয়ে চব্বিশে ঠেকেছে। কিন্তু এই জবাবের কোন তাৎপর্য বোঝা গেল না। মুখভাব সত্যিই বিপন্ন গোছের দেখেছে।

কিন্তু সোমার মুখ লাল তখনো। হাত বাড়িয়ে ফুলের ঝুপড়ি হাতে নিয়ে হনহন করে পুজোর ঘরে চলে গেছে। সোমার পুজোর

অঞ্জলি যা হয়েছে সেদিন সে-ই জানে। দিদিরা পর্যন্ত ওকে লক্ষ করে বলেছে, কি রে, তোর মুখ অত লাল-লাল কেন—সকালে চা করে আবার জ্বরজ্বালা ডেকে আনিস নি তো!

সোমা তাদের চোখ থেকেও পালিয়ে বেড়াতে চেষ্টা করেছে—কারণ ওই লোকের সামনেই বোনেদের এই উদ্বেগ। বাবা তাবে আদর করে আবার খাওয়ার নেমন্তন্ন করে রেখেছে—সে নড়তে যাবে কেন? কিন্তু আড়চোখে সোমা যতবার লক্ষ্য করেছে ওই মানুষকে ততবারই যেন একটা উদাস ভাব চোখে পড়েছে। পেটে পেটে যে বেশ দুষ্টুমি তখন কি তা বুঝেছে! অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই ওই লোকের হাবভাব থেকে তার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে আসছিল সোমার কাছে। রাতারাতি বাবার এত বড় ভক্ত আর সমজদার হয়ে ওঠার কারণ বাবার থেকেও ঢের আগে সোমা বুঝেছিল। বাবার কোন কাজে লাগা বা তার কোন উপকারে আসার জন্যে সর্বদা যেন এক পায়ে প্রস্তুত। আর বাড়িতে তখন ওই লোকের এত প্রশংসা যে সোমার মজাও লাগত, ভালও লাগত। আরো বেশি ভাল লাগত এই কারণে যে, লোকটার দুর্বলতার আঁচ একমাত্র সে-ই পেত। কোষ্ঠিবিচার আর হাত বিচারের ফলে বাবা চব্বিশ পেরুনোর আগে সোমার বিয়ে দেবে না ঘোষণা করে রেখেছিল। সেই চব্বিশে পা দিয়েছে তখন। এ বছরটা পেরুলে সোমা যে কোথায় কোন্ ঘরে পড়বে সে-দুশ্চিন্তা ভিতরে ভিতরে ছিলই। কারণ প্রথম তিন মেয়ের বিয়ে দিতেই বাবার সামান্য পুঁজি একেবারে ঝাঁঝরা। আয়ও দিনকে দিন কমছিল বই বাড়ছিল না। তখন মাঝখানে পড়ে ওই লোক, অর্থাৎ ওই অরবিন্দ গাঙ্গুলিই বাবার মনে আর একদফা ভাগ্যের জোয়ারের আশ্বাস এনে দিয়েছিল। তখন কি ছাই একবারও ভাবতে পেরেছে তলায় তলায় বাবাই বড় রকমের একখানা টোপ ফেলে বসে আছে! সেই টোপ অরবিন্দ গাঙ্গুলিও গিলেছে, সোমাও গিলেছে।

…সেই সরস্বতী পুজোর দিনে খেতে বসার দৃশ্যটাও ভোলবার নয়। প্রথমে পর পর তিন জামাইবাবু খেতে বসেছিল, তাদের পাশে

বাবা, তার পাশে অরবিন্দ গাঙ্গুলি। উল্টো দিকে দিদিদের ছেলেমেয়েরা। পরিবেশন বলতে গেলে সোমাই করছিল বেশির ভাগ, দিদিরা সাহায্য করছিল। অরবিন্দ গাঙ্গুলি কিছুই খাচ্ছিল না, খাবার নাড়াচাড়া করছিল আর মুখখানা বেজার করে বসেছিল। দিদিদের আসল চোখ তাদের বরদের আর ছেলেমেয়েদের দিকে—লোকটার সেই ব্যতিক্রম শুধু সোমাই লক্ষ্য করছিল। ওদিকে বাবা তো কোনদিকে খেয়াল না করে বকর বকর করেই চলেছে। মাঝে মাঝে অকারণ রেগে উঠতে চেষ্টা করছিল সোমা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কি যেন এক কৌতুকের ঝরণা বইছে তার। আড়ে আড়ে ওই মানুষকে বার বার লক্ষ্য করছিল। অরবিন্দ গাঙ্গুলিকে। তারপর সকলকে শুনিয়ে হঠাৎ মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠেছিল, কি হল আপনার—কিছুই খাচ্ছেন না যে ?

সকলের চোখ তার থালার দিকে গেছে। সত্য হালদার বলেছেন, সত্যিই তো কিছু খাচ্ছ না দেখি—কি হয়েছে ?

বিমর্ষবদন অরবিন্দ গাঙ্গুলি জবাব দিয়েছিল, কি লাভ—

শুনে সকলেই অবাক। সত্য হালদার জিজ্ঞাসা করলেন, খাওয়ার মধ্যে আবার কি লাভ অ-লাভ কি !

—না, মানে বলছিলাম কদিনের জন্যেই বা—

নিজের খাবার ফেলে সত্য হালদার ঘুরেই বসেছিলেন তার দিকে। বলেছেন, খেতে বসেও মুখ এত শুকনো···কি ব্যাপার ? ক'দিনের জন্যে মানে কি ?

জবাব শুনে ধন্যি ছেলে ভেবেছিল সোমা সেদিন। মুখখানা আরো বিমর্ষ করে অরবিন্দ গাঙ্গুলি বলেছিল, ইয়ে ভাবছিলাম কদিনের জন্যেই বা এসব আনন্দ আর খাওয়া-দাওয়া—এরকম যার ভবিষ্যত···

দু' চোখ বড় বড় করে বাবা লক্ষ্য করেছে তাকে।—কে কি বলেছে তোমাকে—কি রকম ভবিষ্যত ?

—আত্মহত্যা-টত্যা··

এক সোমা ছাড়া আর সকলেই বোধহয় চমকে উঠেছিল। ভুরু

কুঁচকে বাবা তার মুখের দিকে চেয়েছিল খানিক। মাত্র পাঁচ-সাত দিন আগেও বাবা যে নিবিষ্ট মনে ঠিকুজি দেখেছে তার, সোমা জানে না। তার মুখ টকটকে লাল। আত্মহত্যার বিধিলিপির অর্থ একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

সত্য হালদার আদেশ করলেন, বাটিতে ওই ডান হাতটা ধুয়ে সামনে ধরো তো—

নির্লজ্জ বেহায়া তাই করল।

হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী বাবার পেশা আর জ্যোতিষী নেশা। এই পেশা আর নেশায় বহুবার একাকার হতে দেখেছে মেয়েরা। পেশার দৌলতে রোজগার না হলে অনেক সময় নেশার দৌলতে হয়।

সত্য হালদার ঝুঁকে কররেখা দেখতে লাগলেন। তারপর আধা গর্জন করে উঠলেন, কোন্ আহাম্মক এ-কথা বলেছে অ্যাঁ? আয়ুরেখা বৃহস্পতির মাথায় উঠে বসে আছে, ঝকঝকে চাঁদের ক্ষেত্র ঢিবির মতো উঁচিয়ে আছে—আত্মহত্যা-টত্যার কথা কোন্ উল্লুকে বলেছে তোমাকে? তাছাড়া এই সেদিন না ঠিকুজি দেখে সামনের তিরিশ বছরের ভবিষ্যৎ বলে দিলাম তোমার? কিছু কিছু ঝামেলা আসবে অবশ্য, কিন্তু এরকম কোন কথা তোমাকে আমি বলেছি?

মুখখানা একটু তাজা করে তুলতে চেষ্টা করে অরবিন্দ গাঙ্গুলি আশ্বাস ভিক্ষা করছে যেন।—আত্মহত্যার কোন সম্ভাবনা নেই তাহলে?

সম্ভাবনাটা বাতিল করার তাগিদে সত্য হালদার বলে উঠলেন, না—নেই। ইচ্ছে করলে তুমি হত্যা করতে পারো—আত্মহত্যা-টত্যা নয়! যে বলেছে সে একটা ইডিয়েট আর তুমিও একটা ইডিয়েট—নাও, খাও এখন বসে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেই বেহায়া সোমার দিকে ফিরেছে। —আর এক টুকরো ইলিশ মাছ দেবে?

সোমা একরকম ছুটেই পালিয়েছে সেখান থেকে। ইলিশ মাছ দিদিদের একজনের হাত দিয়ে পাঠিয়েছে। ওর সেই আরক্ত মুখ দিদিদের গবেষণার বস্তু হয়ে উঠেছিল।

···সোমার হাতে তখনো ভাঙা চিরুনি। আয়নার দিকেই চেয়ে আছে।···তারপরেও সেই লোকের জুলুম কত না দুর্বার অথচ লোভনীয় মনে হয়েছে। সে-কথা মনে হলে এখন যত ঘেন্না তত জ্বালা। ···বিয়ের পরে পরেই কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে ফ্ল্যাশবালব আর ক্যামেরা ধার করে নিয়ে এসেছিল একটা। জোর করে ওমনি আদুড় গায়ে চিরুনি হাতে এই আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছে ওকে—মাথা আঁচড়ানোর ঢঙে বেঁকে-চুরে দাঁড়াতেই হয়েছে সোমাকে। আর পিছন থেকে ফটাফট ক্যামেরা চালিয়েছে সে। পিছন থেকে হলে কি হবে আয়নায় তো সামনেটাও পাচ্ছে। কি বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি—সেইসব ছবি দেখে সোমা লজ্জায় বাঁচে না।

তখন লজ্জা। এখন শুধু ঘেন্না। শুধু রাগ।

হঠাৎই বিষম ধাক্কা আবার একটা। পিছনের দরজা দুটো খোলাই ছিল। আর সোমার গায়েও ব্লাউস ছিল আজ। আয়নার ভিতর দিয়ে দরজার ওধারে যে বিহ্বল মূর্তি চোখে পড়ল সেটা অপ্রত্যাশিত। সোমা সম্পূর্ণই বিমনা হয়ে পড়েছিল আর নিজেকে দেখছিল। দরজাটা সোজা পিছনে নয়, একটু আড়াআড়ি। ঘাড়টা খানিক বাঁয়ে ঘোরালে তবে চোখে পড়ে। আয়নার ভিতর দিয়ে হঠাৎ চোখোচোখি। না, আজ সোমা চমকে ওঠেনি খুব, ধাক্কা খেয়ে আয়নার ভিতর দিয়ে থমকে তাকিয়েছে।

বরুণ চক্রবর্তী।

···এই মাত্র এসে দাঁড়াল মনে হয় না। কয়েক সেকেণ্ড অন্তত হবে। চোখোচোখি হবার পরেও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে।

হঠাৎ চমক ভাঙতে দিশেহারা মুখ। যে মুখে গোটা কতক বসন্তের দাগ। হাঁস-ফাঁস করে কিছু একটা বলতে চাইল, কৈফিয়ত দিতে চাইল বোধহয়। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। বিপাকে পড়ে হন্তদন্ত হয়ে বাবার দপ্তরের দিকে ছুটল আবার।

পায়ে পায়ে সোমা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। না বাবার ঘরেও ঢোকেনি। বাইরে দাঁড়িয়ে বাবাকে কিছু একটা বলে পালাবার জন্য

পা বাড়িয়েছে। সেই সঙ্গে এদিকেও ঘাড় ফিরিয়েছে।

আবার চোখোচোখি।

সোমা ভুরু কুঁচকে তাকালো। তারপর একটা আঙুল তুলে বাবার ঘরটা দেখিয়ে দিল।

বরুণ চক্রবর্তীর পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেছল। আদেশ বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সুড়সুড় করে হালদারের দপ্তরে ঢুকে গেল।

হীটারে চায়ের জল চড়িয়ে সোমা আবার এসে ঘরে ঢুকল। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য একটু হাসি ঝুলছে। ভোর রাত থেকে একটা গুমোটভাব অশান্তির মতো বুকের ওপর চেপে বসেছিল। একটুখানি খুশীর ছোঁয়ায় সেটা হালকা হল।

মশারি সরিয়ে ঘুমন্ত ছেলেকে টেনে তুলল। দ্বিতীয় দফার ভারী ঘুম ভেঙে সে উঠতে নারাজ। তাছাড়া সকাল সোয়া ছটা তখন। কিন্তু ছেড়ে দিলে আটটা নটা পর্যন্তও ঘুমোতে পারে। এটা মনে হওয়া মাত্র ভিতরটা উষ্ণ হয়ে উঠল আবার এক দফা।...আর একজনেরও এই স্বভাব। রাতে চোখের তারায় জোনাকি জ্বলে, সকালে বিছানা ছাড়ার নাম নেই। হাত পা ছুঁড়ে ছেলে আবার শোবার উপক্রম করতে দু কাঁধ ধরে বেশ কয়েকটা ঝাকুনি দিয়ে তার শোয়ার চেষ্টা সিকেয় তুলে দিল।—ওঠ্ শিগগীর, নয়তো গায়ে জল ঢেলে তোর ঘুম বার করছি আমি।...দাদুর বাইরের ঘরে বরুণকাকা বসে আছে দেখগে যা।

শেষের সংবাদে ছেলের আলস্য গেল। তার বিবেচনায় বিশ্ব-সংসারে একমাত্র দরাজ দাতা হল গিয়ে বরুণকাকা। যখনই আসে হাতে ওর জন্য কিছু না কিছু থাকেই। তড়াক করে খাট থেকে নেমে ছুটতে গেল। কিন্তু তার আগেই মায়ের শক্ত হাতে তার একখানা বাহু আটকা পড়ে গেল।

অন্য হাতের আঙুল তুলে গম্ভীর শাসনের সুরে বাথরুমের দিকটা দেখিয়ে দিল।—আগে ওই দিকে। এক কথা কতদিন বলতে হবে তোকে?

তাড়া খেয়ে ছেলে সেই দিকেই চলল। এই মায়ের জন্য যেন

যন্ত্রণার শেষ নেই—এমনি মুখ।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে মশারি বালিশ সরিয়ে বিছানা ঝেড়ে-ঝুড়ে ঢাকা দিয়ে সোমা বেরিয়ে এল। ঝি এসে উনুনে আঁচ দিয়েছে। নাকে ধোঁয়ার গন্ধ আসতে চোখে মুখে বিরক্তির ভাব। কতদিন ধরে ভাবছে বাড়িতে গ্যাস আনবে। কিন্তু শুরুতেই চার-পাঁচশ টাকা খরচ—এ জন্মে আর হবে না বোধহয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে না হওয়ার চিন্তাটাও বাতিল। স-ব হবে—আর এ জন্মেই হবে। সোমার মন স্থির হয়ে এসেছে প্রায়—কোন কিছু না হওয়ার সঙ্গে আর তার আপোস নেই।

চা করল। ঘি-চিনি দিয়ে মুড়ি মেখে চটপট তিন বাটিতে সাজালো। তারপর ঝিকে বাইরের ঘরে সব নিয়ে যেতে বলে নিজে সেদিকে পা বাড়াল।

—টাকা পয়সার দিক থেকে তোমার এখন সময়টা ভাল, বুঝলে।...কর্মপতি ভাগ্যপতির জুটিতে একাদশ রাহু...ঝপঝপ অনেক টাকা পাবে।

ঘরে ঢোকার আগে বাবার গণনা কানে আসতে সোমা দরজার এধারে দাঁড়িয়ে গেল একটু। শ্রোতার নরম গলাও কানে এল।

—রাহু-টাহু শুনলে তো ভয় করে।

—আরে না না ছপ্পর ফুঁড়ে দিতে হলে একমাত্র গ্রহ একাদশের রাহু—চন্দ্র-সূর্যি গিলে বসে থাকে দেখো না!

চা জলখাবার নিয়ে ঝি আসছে। সোমা ভিতরে ঢুকে গেল। টিপ্পনী কেটে বলতে ইচ্ছে করল চন্দ্রসূর্য গিলে কি লাভ, পেটে তো যায় না, তার আগেই কাটা-গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে। বলল না। ও ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চুরি-ধরা-পড়া মুখ লোকটার। সে পাশের বেঞ্চিতে বসে আর সান্টু অর্থাৎ ছেলে সটান তার কোলে শুয়ে একটা রঙিন ছবির বই দেখছে।

মাথা একটু নুইয়ে চশমা আর কপালের ফাঁক দিয়ে মেয়ের মুখখানা একবার ভাল করে দেখে নিলেন সত্য হালদার। মেজাজের সঠিক

হদিস পেলেন না বোধহয়। বললেন, কি রে, আজ চা-টা দিবি না—

জবাব দেওয়ার দরকার হল না। সব নিয়ে ঝি ঘরে ঢুকছে।

সাড়া পেয়ে ছবির বই হাতে সান্ন তড়াক করে উঠে বসল। খুশি-ভরা মুখ।—মা, বরুণকাকা আমার জন্য ছবির বই এনেছে আর তোমার জন্য এন্তার মাছ—ফাস্‌কেলাস!

নাতির ফাস্‌কেলাস-এর উচ্ছ্বাস দেখে সত্য হালদার হাসতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মেয়ের কপালে ভ্রূকুটি দেখে বরুণ চক্রবর্তীর হাসির চেষ্টাটুকুও মার খেল। মুড়ির বাটি সমেত চায়ের ট্রে সামনের টেবিলে নামিয়ে দিয়ে ঝি চলে যেতে সোমার হু' চোখ বাবার চেয়ারের পাশে মাছের থলেটার ওপর গিয়ে পড়ল। ছেলে এই ফাঁকে একটা মুড়ির বাটির ওপর দখল নিয়েছে। সত্য হালদার একটা টেনে নিলেন। তৃতীয় বাটি বরুণ চক্রবর্তীর সামনে ধরে সোমা রুক্ষ স্বরেই বলল, রোজ রোজ এত মাছ আনার কি দরকার পড়েছে—এগুলো কি বিনে পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে নাকি?

রাগের কারণ আর কিছু কিনা বরুণ চক্রবর্তী নিঃসংশয় নয়। মুড়ির বাটি হাতে নিয়ে জোর করেই হাসতে চেষ্টা করে জবাব দিল, আমার তো পয়সা সত্যিই লাগে না—লাভ থেকে কাটান যায়।

—লাভ থেকে কাটান গেলে সেটা লোকসান নয়—কেমন? মেজাজ কেন যে সত্যিই তেতে উঠল সোমা নিজেও জানে না।—কেন আপনি রোজ রোজ এত আনবেন—স্কুল, রান্না, ছেলে-পড়ানো—আমারই বা এত বেশি বেশি করার সময় কোথায়?

গেল সপ্তাহে হুদিন মাছ এনেছিল এ সপ্তাহে এই শুরু, তার মানে রোজ আনা নয় এটা বলা যেতে পারত। কিন্তু মুড়ির বাটি হাতে খাবি খেতে খেতে বরুণ চক্রবর্তী নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা দেখল। বলল, ইয়ে—সুবিধে পেলে উনি আনতে বলেছিলেন—তাই—

উনি অর্থাৎ বাবা। সোমা রুষ্ট নেত্রে তাঁর দিকে ফিরল। বাবার এই স্বভাব জানা আছে। যেখানে যা সুবিধে সেখানে সেইরকম চেয়ে বসে। মুড়ি চিবুতে চিবুতে বিরক্ত মুখ করে সত্য হালদার বললেন,

সামান্য ব্যাপারে তুই এত মেজাজ দেখাস কেন আজকাল, হ্যাঁ স্থবিধে হ'লে মাঝে মধ্যে আমিই তো আনতে বলে দিয়েছি—ও এই ব্যবসা ক'রে ওকে বলব না তো কাকে বলব ?

—কেন বলবে ? সোমার ঝাঁঝালো প্রশ্ন, বিনে পয়সায় আমাদের এত মাছ খাওয়ানোর কি দায় পড়েছে ওঁর ?

মেয়ের অবুঝপনায় সত্য হালদারও তেতে উঠছেন।—দায় আবার কি, ও আমাদের পর ভাবে না আমরা ওকে পর ভাবি ? আপনার লোকের জন্য এরকম অনেকেই অনেক করে থাকে। এই যে সকালে উঠেই ঠিকুজি দেখে ওর পিত্তির ব্যামো ধরার কথা বলে দিলাম আর তার জন্য ওষুধও দেব বললাম—সেই সঙ্গে থোকে থোকে টাকা পাবে জানালাম—এবারের জন্যে আমি ওর কাছ থেকে কোনরকম ফী আদায় করছি ? নে—চা ঢাল—এবেলা না পারিস তো সাঁতলে রেখে দে, ওবেলা হবে'খন।

দু' পেয়ালা চা ঢেলে দিয়ে সোমা পট আর নিজের পেয়ালা নিয়ে ভিতরে চলে এল। সত্যি কেন যে এত অল্পেতে মাথাটা গরম হয়ে যায় আজকাল ভেবে পায় না। কেবল মনে হয় কেউ সোজা রাস্তায় চলছে না, ভিতরে ভিতরে সকলেই যেন এক-একখানা জটিলতার স্তূপ।

রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া সরেনি এখনো। বাইরের দাওয়ায় সোমা নিজে চা নিয়ে বসল। ঝি বাসি ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। হাতের কাজ শেষ হলে সেও এক গেলাস চা নিয়ে বসবে আর ইনিয়ে-বিনিয়ে পাঁচটা স্বার্থের কথা শোনাবে ওকে।

এক হাতে মাছের থলে অন্য হাতে মুড়ির বাটি নিয়ে সানু মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। মাছ খেতে তার ভাল লাগে, মা যে কেন রাগ করল বুদ্ধিতে আসে না। অনুমান, মাছ জিনিসটা মায়েরও অপছন্দ নয়। দাদুর কথায় থলেটা নিয়ে এসেছে এও মায়ের পছন্দ হলে হয়।

কিন্তু মা কিছুই বলল না দেখে থলেটা রান্নাঘরের দরজার সামনে রেখে সানু একটু সাহস সঞ্চয় করে বলল, একেবারে কেটেকুটে টুকরো ক'রে এনেছে তোমার খুব কষ্ট হবে না মা।

বলার পরেই বুঝল ভুল হয়ে গেল। মায়ের দু' চোখ তার দিকে ঘুরল, চাউনি সদয় মনে হল না। গেল বারে বরুণকাকা আস্ত মাছ আনার দরুণ মা তাকে গজগজ করে কি বলেছিল মনে হতে এই আশ্বাস দিতে গেছল।

—খাওয়া হয়েছে?

সান্নু ঘাড় কাত করল। হয়েছে।

—জল খেয়ে বই নিয়ে বোস্ আমি আসছি।

পিঠে আজ দুই এক ঘা পড়ার সম্ভাবনা আঁচ করে বেজার মুখে ছেলে ঘরে চলে গেল।

পেয়ালাটা শেষ করে সোমা আর একটু চা ঢেলে নিতে যাচ্ছিল, তার আগেই সোজা মুখ তুলে তাকালো একবার। পায়ে পায়ে বরুণ চক্রবর্তী আসছে। চোখোচোখি হতে থমকে দাঁড়াল একটু। অপরাধী মুখ।

আসবে সোমা জানত। বলতে গেলে অপেক্ষাই করছিল। লোকটা চা না খেয়েই চলে যাচ্ছিল ভয়ে। তাতে বাধা পড়েছে যখন আর একবার না এসে পারবে না জানা কথাই। লোকটার এই মুখ দেখে হাসি পাওয়ার কথা সোমার কিন্তু হাসির সঙ্গে যেন সম্পর্ক ঘুচে গেছে তার।

দ্বিধা কাটিয়ে বরুণ চক্রবর্তী সামনে এসে দাঁড়াল। জবাবদিহি করার সুরে ফস করেই বলে ফেলল, চায়ের তাগিদ দেবার জন্য তোমার বাবাই তখন আমাকে ভিতরে পাঠিয়েছিলেন—

মানুষটা স্বস্তি বোধ করবে না জেনেও সোমা তার মুখের ওপর দু' চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল, তাতে কি হয়েছে?

—না ইয়ে···তুমি রেগে গেছ নিশ্চয়।

রাগব কেন, আপনি কি করেছেন?

জবাব হাতড়ে পেল না বরুণ চক্রবর্তী। তার হাঁসফাঁস দশা দেখে সোমার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি এসেই গেল একটু। আর বেশি সংকটের মধ্যে রাখল না তাকে। বলল আপনি এত ভীতু কেন?

—ভী-ভীতু কে বলল?

—আমি। চা না খেয়ে চলে যাচ্ছিলেন কেন?

এবারও চট করে জবাব দিতে পারল না বরুণ চক্রবর্তী। কিন্তু তার ভিতর থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল যেন। হাতের কাছে একটা মোড়াটোড়া পেলে একটু বসার ইচ্ছে। নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই বেঁকে-বেঁকে মাথা আঁচড়ানোর দৃশ্যটা তাকে যেন কাচ-পাকার মতো আটকে ফেলেছিল। স্থান-কাল ভুলেই দেখছিল সে। এই মেয়ে অতটা খেয়াল করেনি বা গর্হিত কিছু ভাবেনি মনে হতে আশ্বস্ত। ফলে আর একটু থাকার লোভ আরো একটু দেখার লোভ। বলল, তোমার মেজাজের ঠিক পাইনে তাই—নইলে আমাকে ভীতু কে বলে—মাছের ব্যবসায় এক একসময় কত রিস্ক নিই জানো!

ছেলেমানুষের দম্ভের মতো কথাগুলো মন্দ লাগল না সোমার। কিন্তু কিছু বলার আগে ঝি এসে সামনে দাঁড়াল। পটটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে সোমা বলল, নিয়ে যা—

পট তুলে নিয়ে ঝি প্রস্থান করল। সুসমাচার শোনাবার মতো মুখ করে বরুণ চক্রবর্তী আবার বলল, ঠিকুজী দেখে তোমার বাবা বললেন সামনে নাকি খুব ভাল সময় আমার—

বাবার গণনার এক বর্ণও আর বিশ্বাস করে না সোমা। এই গণনার ফাঁদে ফেলে চব্বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত ওর বিয়ে আটকে রেখেছিল। তারপর আর একজনের সম্পর্কেও এমনি মস্ত ভবিষ্যৎ দেখিয়েছিল। বলেছিল একেবারে পয়লা নম্বরের রাজযোটক নাকি। সোমার বিশ্বাস নিজের স্বার্থের আয়নায় যেমন দেখে তেমনি ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে তার বাবা।

টিপ্পনীর সুরে বলল, পিত্তির ব্যামো ধরবে সেই ভাল সময়?

বিদ্রূপ বুঝেও বিশ্বাসভরেই বরুণ চক্রবর্তী জবাব দিল, ব্যবসার ছোটাছুটির ফলে খাওয়া-দাওয়ার সময়ের ঠিক নেই—ওই গোছের রোগ হতেই পারে—একটা মুন স্টোনও ধারণ করতে বলেছেন উনি।

বক্র কটাক্ষে উদ্ভাসিত মুখখানা একবার দেখে নিল সোমা।—মুন স্টোন আপনি চেনেন? কেন ধারণ করা হয় ওটা আপনি জানেন?

—না। চাঁদের ব্যাপার-ট্যাপার হবে…তোমার বাবাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কিনে দেবেন বললেন।

এই রকমের হবে সোমা জানত যেন। বাবার পকেটে কিছু কমিশন আসবে। অকুস্থলের রাহুর কোপ উপশমের জন্য আর একজনকেও নিখুঁত দামী গোমেদ কিনে দেওয়া হয়েছিল। সেই গণনা অবশ্য খুব একটা ভুল ভাবছে না সোমা, কারণ রাহুর মতিগতি ভিন্ন মানুষের স্বভাব এরকম হয় না—কিন্তু সেই লোকের বেলায় গোমেদ নিষ্ফল হয়েছে।

চাপা ঝংকার দিয়ে বলে উঠল, কিচ্ছু ধারণ করতে হবে না—চাঁদের রোগ ধরে থাকে তো রোজ রাত্তিরে চাঁদের দিকে চেয়ে বসে থাকবেন খানিকক্ষণ করে। হাসি চেপে উঠে দাঁড়াল।—আমার এখন অনেক কাজ—এবেলা আর কিছু করতে পারব না, আপনি রাতে এসে মাছ খেয়ে যাবেন।

ভিতরে ভিতরে বিগলিত বরুণ চক্রবর্তী। সম্ভব হলে হাত ধরে আটকে রাখত তাকে। বলত, আরো খানিক থাকব—আরো একটু বসতে হবে তোমাকে। না অত সাহস নেই।

—আচ্ছা, আচ্ছা। উল্টো দিকে পা বাড়িয়ে আবার কি মনে পড়তে ঘুরে দাঁড়াল। কাঁচুমাচু মুখ। বসন্তের দাগ কটা দিয়েও যেন ভিতরের বিড়ম্বনার হদিশ মিলছে।—রাগ না করো তো একটা কথা বলি?

মুখে হাঁ-না কিছুই বলল না সোমা। ষষ্ঠ চেতনাই যেন তাকে বলে দিচ্ছে যা শুনবে তাতে রাগ হবেই।

না বললেও এরপর রাগ যে হবেই এও বুঝে নিয়ে নিরুপায়ের মতোই বরুণ চক্রবর্তী বলে ফেলল, আসার সময় পথে অরবিন্দর সঙ্গে দেখা…কিছু টাকার দরকারে আমার ওখানেই যাচ্ছিল…

আর বলতে না দিয়ে সোমা ফুঁসে উঠল।—আপনি টাকা দিলেন?

—না না—আমার সঙ্গে টাকা ছিলই না—পরে বাড়ি যাবে বলল—

তেমনি তপ্ত মুখে সোমা বলে উঠল, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এক পয়সাও দেবেন না—কিছু দিয়েছেন শুনলে আপানার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

আগেও এক-আধবার টাকা দেওয়া হয়েছে শুনে এই রকমই অগ্নিমূর্তি দেখেছে সোমার। আর এই গোছেরই বচন শুনেছে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না—কিছু দিইনি, দেবও না—আমি সেকথা বলছিলাম না—

এবারে নীরব জিজ্ঞাসায় সোমার তু' চোখ তার মুখের উপর স্থির একটু। আমতা আমতা করে বরুণ চক্রবর্তী জানান দিল, ইয়ে··· মাছের থলের মাছ দেখে অরু বলছিল অনেকদিন ভাল মাছ চোখে দেখিনি, পারিস তো খানকতক মাছ ভাজিয়ে তোর ঘরে এনে রাখিস···

মুখে আবার কঠিন লালের আভা ছড়াতে লাগল সোমার। সেই লাল কানের ডগা বেয়ে চোখের কোণ পর্যন্ত উঠে আসছে। বরুণ চক্রবর্তী ঘাবড়েই গেল।

সোমার গলার স্বর চড়ল না একটুও, বলল, সেদিন যে আপনার সঙ্গে বসে ইংরেজী ছবিটা দেখে এলাম মনে আছে?

বিমূঢ় মুখে বরুণ চক্রবর্তী মাথা নাড়ল। মনে আছে।

—কাল ভোর রাতে স্বপ্ন দেখলাম গাড়ির চাকার নিচে একজনকে ফেলে আমি নিজেও ওই করছি—

বরুণ চক্রবর্তী আঁতকে উঠল প্রায়। কা-কাকে?

আপনাকে নয়। আপনার ইচ্ছে হয় কাঁচা মাছ নিয়ে যান।

এই মুখ এই চোখ দেখে আর এই কথা শুনে বরুণ চক্রবর্তী ঘেমে ওঠার দাখিল। সে প্রস্থান করে বাঁচল।

॥ দুই ॥

বেলা সাড়ে দশটা তখন। ছেলেকে খাইয়ে-দাইয়ে তৈরি করে এবং নিজে খেয়ে তৈরি হয়ে সোমা বেরুবার জন্য প্রস্তুত হল। ছেলের এগারোটায় স্কুল, নিজেরও তাই। সান্নুকে তার স্কুলে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে সাত-আট মিনিট হাঁটলে তার স্কুল। ঘর বন্ধ করার আগে আয়নার সামনে দাঁড়াল একবার। ভিতরের যন্ত্রণা বাইরের স্বল্প প্রসাধনের তলায় ঠিক ঠিক চাপা পড়েছে কিনা তাই দেখে নেয় হয়ত।

ঘর তালাবন্ধ করে চাবিটা বাবার হাতে দিয়ে আসতে গিয়েও ভিতরে ঢুকতে পারল না। ভিতরে বচসা শুরু হয়েছে। কোন এক রোগী অথবা ভক্ত বিগড়েছে। বাবার তপ্ত গলা কানে এল, বিশ্বাস চলে গিয়ে থাকে তো যে চুলোয় খুশি যাও—কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে?

যে এসেছে তারও চড়া গলা। গেল হপ্তায় এক টাকা ফী আর এক টাকা ওষুধের দাম আমি গুণে দিয়ে গেছি—ওই সঙ্গে তাবিজ তো আপনি নিজে সেধে দিয়েছেন—তার জন্যে আরো আট টাকা আপনার পাওয়া হয়ে গেল! ও-টাকাটা না পেলে আপনি ওষুধ দেবেন না এ কি মগের মুলুক পেয়েছেন?

—হ্যাঁ পেয়েছি মগের মুলুক, যাগযজ্ঞ করা কবচ, আট টাকা দিতে না পারো চার টাকা দাও, নেহাৎ অপারক হলে দু' টাকা দাও—তা না করে তুমি মেজাজ দেখাতে এসেছ কাকে হে? এক সপ্তাহের মধ্যে হাতে-নাতে ফল পেয়ে এখন সিংহ অবতার—কেমন? সাতদিন আগে তো চিঁ-চিঁ করছিলে. অবিশ্বাস করার সাহস থাকে তো চলে যাও—

বাইরে ছ' বছরের ছেলেটা উৎফুল্ল উত্তেজনায় মায়ের দিকে তাকালো।—দাদুর সঙ্গে লেগে গেছে মা, দেখে আসব?

চোখ দিয়েই সোমা ছেলেকে ধমকে নিল একপ্রস্থ। তারপর চাবি তার হাতে দিয়ে বলল, দাদুর হাতে দিয়ে আয়, এক সেকেণ্ডও দাঁড়াবি না!

ছেলের হাত ধরে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল সোমা। কিছুদিন ধরে যা ভাবছে সেই সমস্যাটাই মাথায় এল আবার। ছেলেটাকে এখানে এই পরিবেশে রাখা ভুল হচ্ছে। ভাবছে এখানে রেখে ওকে মানুষ করা মুশকিল। এ ব্যাপারে বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে একদিন। সে বলছিল, নরেন্দ্রপুর না কোথায় ভাল আবাসিক স্কুল আছে একটা, আর তার সঙ্গে চেনাজানাও আছে —ছেলেদের বোর্ডিং-এ বেশির ভাগ মাছ সে-ই সাপ্লাই করে—চেষ্টা করে দেখতে পারে।

সোমা মন স্থির করে উঠতে পারেনি। খরচেরও প্রশ্ন আছে।

বি. টি. পাস না হওয়ার দরুণ সামান্যই মাইনে পায়। ওখানে রেখে পড়াতে হলে অর্ধেক ওতেই বেরিয়ে যাবে।

তবু দরখাস্ত একটা করে রাখবে ভাবছে বরুণ চক্রবর্তীর মারফত। মন থেকে ভাবনা সরালো আপাতত, বছরের মাঝখানে তো আর হবে না কিছু।

ছেলের হাত ধরে চলার গতি বাড়ালো। হাতে আর মিনিট কুড়ি সময় আছে হয়তো। সোমার একটা হাত-ঘড়ির সখ, কিন্তু এ পর্যন্ত তাও হয়ে উঠল না। বাড়িতে বাবার একটা আদ্যিকালের ঘড়ি আছে তাই দেখে ওঠা-বসা। এসব কথা মনে হলেই অসহিষ্ণুতা বাড়ে।

—এত জোড়ে হাঁটছ কেন···দাত্নর সঙ্গে কত আস্তে আস্তে ফিরি।

তিনটেয় ছুটি ওদের। সে-সময় দাতু নিয়ে আসে নাতিকে। জবাব না দিয়ে সোমা তেমনি দ্রুতই চলল। আসলে ওর রাস্তায় যা-কিছু সব দেখতে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে জাগে।

—বোলো হরি—হরি বো-ও-ল।

মৃতদেহ নিয়ে আসছে কারা। সামনের দিকে চেয়ে অভ্যাসবশত সোমা কপালে একটা হাত তুলতে গিয়ে থমকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রক্ত উঠে এল মুখে। গায়ে আধ-ময়লা গেঞ্জি, মালকোছা মারা কোমরে গামছা বাঁধা, মুখে বিড়ি—খাটিয়ার সামনের একদিকে কাঁধ দিয়ে শব নিয়ে আসছে যে লোকটা—এই উষ্মার কারণ সে।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি।

দূর থেকে সোমাকে আর ছেলেকে দেখেছে সেও।

সান্নু সানন্দ বিস্ময়ে বলে উঠল, মা, বাবা!

পারলে মায়ের হাত ছাড়িয়ে সেদিকে ছোটে। সোমা শক্ত হাতে ধরে নিয়ে চলল তাকে। ফিরে আর ওদিকে তাকাতেও রাজি নয়। এরকম পরোপকার দেখে দেখে ছু'চোখ পচে গেছে তার। কোন্ বাড়ি থেকে কে গেল এখন আর সে কৌতূহলও হয় না। সেবার জন্য হোক বা শবদাহের জন্য হোক চেনা আধা-চেনা যে-কোন বাড়ি থেকে যে কেউ ডাকলেই হল। ডাকতেও হয় না সব সময়, খবর কানে গেলেই

হাজিরা দেবে, যতটা সম্ভব সর্দারি করবে। বাহাদুরি নেবে। সে উপস্থিত না থাকলে কোথায় কার কি কাজ পণ্ড হয়ে যেত নিজেই আর দশজনকে তার ফিরিস্তি শোনাবে। নিজের গুণপনা জাহিরের ফলে কেউ খুশি হয় না, উল্টে বিরক্ত হয় সকলে। কত জনে ঠাট্টা-ঠিসারা করে টীকা-টিপ্পনী কাটে—কিন্তু তা হলেও স্বভাব যাবে কোথায়। নিজেকে পাঁচগুণ বড় করে দেখানোটা একটা রোগের মতো।

সোজা না তাকালেও সোমা আড় চোখে লক্ষ্য করছে।…তার জায়গায় আর একজন খাটিয়ায় কাঁধ দিচ্ছে। মুখের বিড়ি ফেলে লোকটা এদিকেই আসছে এবার। কোনরকম বাক্যালাপের ইচ্ছে নেই বোঝানোর জন্যেই কঠিন মুখে সোমা ফুটপাথের ও-ধার ঘেঁসে চলতে লাগল।

কিন্তু যে আসছে সে-ও নাছোড়বান্দা। ফুটপাথে উঠে সোজা মুখোমুখি পথ আগলে দাঁড়াল। হাসি-হাসি মুখ। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ির জন্য আরো কুৎসিত লাগছে। বলল, আড়াই বচ্ছর ভোগান্তির পর বীণার মা-টা গেল।…তোমার কাছে টাকা হবে গোটাকতক?

কত বড় নির্লজ্জ অমানুষ হলে ওর কাছেই এসে এভাবে টাকা চাইতে পারে সে শুধু সোমাই জানে। থমথমে মুখে মাথা নাড়ল—টাকা হবে না। সামনে পা বাড়ালো অর্থাৎ লোকটাকে সরে যেতে বলছে।

ছেলেটা অমনি নিজে ছোট্ট বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে উঠল, আমার কাছে চার আনা আছে। নেবে?

দিন কয়েক আগে জামা পরতে গিয়ে একটা সিকি পড়ে গেছল দাদুর পকেট থেকে, সানু ছুটে গিয়ে সেটার ওপর দখল নিয়েছিল। দাদু উদার হয়ে সিকিটা দিয়েই দিয়েছে ওকে। স্কুলে কিছু কিনে খাওয়ার ব্যাপারে মায়ের কড়া নিষেধের ফলে সিকিটা এখনো আস্তই আছে। রোজ স্কুলে যাবার সময় ওটা পকেটে করে নিয়ে যায়, ছেলেদের দেখায় তারপর আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি জোরেই হেসে উঠল। হাত বাড়িয়ে ছেলেকে একটু আদর করতে গেল তারপর। ক্রুদ্ধ সোমা এক হ্যাঁচকা টানে ছেলেকে টেনে নিয়ে ছোঁয়া বাঁচালো। মরা ঘাঁটাঘাঁটি না করলেও ছুঁতে দিত

কিনা সন্দেহ। পাশ কাটিয়ে ছেলের হাত ধরে হনহন করে চলল আবার। ছেলে পিছন ফিরে দেখছিল, একটা ঝাঁকুনির ফলে সামনে তাকাতে হল।

ওর সর্দারির জন্য রাস্তাতেই দু'ঘা বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল সোমার। তার ওপর সানু আবার বলে বসল, বাবা টাকা চাইল, টাকা দিলে না কেন মা?

—টাকা নেই! ফের একটা কথা বললে তোকে আমি বাড়ি নিয়ে গিয়ে পিটব এবার!

নিজের অপরাধ সম্বন্ধে ছেলেটা যথেষ্ট সচেতন নয়। কেবল একটু বোঝে বাবাকে মা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আর এও স্থির জানে, মা সত্যি কথা বলল না। মায়ের হাতের ওই বটুয়ায় কয়েকটা টাকা সর্বদাই থাকে। কিন্তু এর পর আর সে-কথা বলার সাহস নেই।

সোমা তখনো জ্বলতে জ্বলতে পথ চলেছে। কে বীণা আর কে তার মা খুব ভাল করেই জানে। আধ মাইল দূরের ওই ভট্চায বাড়ির মেয়ে আর ভট্চায বাড়ির বউ। আধবুড়ো ভট্চায মশাই গাড়ি চাপা প'ড়ে মরে অতবড় সংসারটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। তার একটা ভাইপো ছিল, এই লোকের অর্থাৎ অরবিন্দ গাঙ্গুলির প্রাণের বন্ধু। ভট্চায মশাই মারা যাওয়ার মাত্র দিনকতক আগে সেই ছেলে পুলিসের গুলি খেয়ে মরেছে। এই থেকেই বোঝা যায় কোন্ দলের সঙ্গে যোগসাজস ছিল তার। কিন্তু দীপেন বলতে জিভে জল আসত ঘরের লোকের। ভট্চাযের ঐ ভাইপোর বন্ধুর নাম ছিল দীপেন। গুলি খেয়ে মরার আগেও সে দু'দিন বেঁচে ছিল। সে নাকি বলে গেছল—যারা থাকল তাদের দেখিস একটু।

এই দেখার বাড়াবাড়িতে সোমা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ক্রমশ। নইলে ওই অভিশপ্ত বাড়ির মানুষগুলোর জন্য তারও গোড়ায় গোড়ায় একটু দয়ামায়া ছিল না এমন নয়। দু' দুটো অঘটনের পর ওই ভট্চাযের বউ আর তার বড় মেয়ে বীণা বাড়িতে আসত। তারপর আসা ঘুচেছে। আসবে কোন্ মুখে?

…মেয়েটার মধ্যে কিছু রং-ঢং ছিল। দেখতে-শুনতে মোটামুটি। কিন্তু বাইরের চটক ছিল কিছু। বয়েসে বছর তিনেকের ছোট সোমার থেকে। এখন সোমার একতিরিশ, তার আটাশ হবে। সে-পাট চুকে গেছে। ভাল গান গাইত। এখনো ছোট মেয়েদের গান শিখিয়েই যা সামান্য রোজগার করে শুনেছে।…সেই গানই কাল হয়েছিল মেয়েটার। সোমার বিয়ের এক বছরের মধ্যেই সেই ঘটনা। দু-তিনজনের কাছে বিনা পয়সায় গান শিখত। তানপুরা নিয়ে কতদিন তাকে এই পথে যাতায়াত করতে দেখেছে।

ওর মা হঠাৎ একদিন বাড়ি এসে বুক চাপড়ে কেঁদে পড়েছিল। তার মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। গত রাতে বাড়ি ফেরেনি। পরদিন সকালে কে একজন নাকি একটা চিঠি দিয়ে গেছে তাতে মেয়ে লিখেছে ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই সে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে, আপাতত তার খোঁজ না করাই ভাল। সময় হলে সে-ই জানাবে।

তাই শুনে ঘরের লোকের এমন দিশেহারা ভাব, যেন তারই মস্ত বিপদ ঘটে গেছে একটা।. ছোটাছুটি করে যে খবর সংগ্রহ করে এনেছে তার সারমর্ম, বীণা একাই নয় তার গানের মাস্টারদেরও একজনের সন্ধান মিলছে না। সেই লোকটি স্বজাতের নয়, কায়স্থ। তার বাড়ি বেনারসে।

দিন বারো-চোদ্দ বাদে বীণার মা আবার একখানা চিঠি হাতে করে এ-বাড়িতেই এসে কেঁদে ভাসালো। বীণার চিঠি। বেনারস থেকে এসেছে। লিখেছে, এভাবে পালিয়ে এসে দুঃসহ একটা ভুলই করেছে সে। যে লোককে বিশ্বাস করেছিল সে বিশ্বাসঘাতকতার পথে পা দিয়েছে আঁচ করা মাত্র বীণা বেনারসের অন্য আশ্রয়ে সরে এসেছে। ওই লোক তাকে বিয়ে করবে বলেছিল। আর তার বেনারসের বাড়িতে রেখে উচ্চাংগ সংগীতে তাকে অনেক দূর এগিয়ে দেবে আশ্বাস দিয়েছিল। একজন শিল্পী এতবড় হীন আর লোভী হতে পারে সে কল্পনা করেনি। যাই হোক, অপূরণীয় ক্ষতির আগেই ওখানকার এক আশ্রমে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু এখানেও

কারো কারো মতিগতি সে ভাল দেখছে না। এই অবস্থায় পত্র-পাঠ উদ্ধারের ব্যবস্থা না করলে···ইত্যাদি—

সেই চিঠি পড়ে ঘরের লোক সোমা বা তার বাবার সঙ্গে কোন-রকম পরামর্শ না করে ওই রাতেই বেনারসের গাড়ি ধরেছে। হাতে টাকা ছিল না আর সোমার কাছেও টাকা চেয়ে পায়নি সেই রাগে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল করেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে কিভাবে টাকা সংগ্রহ হয়েছে পরে জেনেছে। বরুণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে। বেনারস ছুটেছে আর তিনদিনের মধ্যে বীণা ভট্টচাযকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর বিগলিত বদনে ঘরে ফিরেছে। নিজেই সতেরবার করে বলেছে, মেয়েটার বড় রকমের কোন ক্ষতি হয়নি, বুঝলে। চালাক মেয়ে তো···খুব বেঁচেছে।

শুনে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেছে সোমার। এতবার করে ঢাক পিটিয়ে বলার ফলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে। যে অত পথ ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে সে ওই মেয়েকে ওমনি ছেড়ে দেয়নি। কিন্তু সব থেকে রাগ হয়েছে তার এই লোকের আদিখ্যেতা দেখে। যেন নিষ্পাপ সীতা উদ্ধারের কৃতিত্ব নিয়ে ঘরে ফিরে এল।

সেই বেহায়া মেয়ে তার পরেও দু-চারবার হাসি মুখেই এ-বাড়ি এসেছে। তারপর সোমা বা তার বাবার মনোভাব বুঝেই আসা বন্ধ করেছে। ও-বাড়ির সঙ্গে এত দহরম-মহরম আর তাদের ভালর জন্যে এত আবেগের সবটাই সোমা সরল চোখে দেখেনি। মৃত বন্ধুর শেষ অনুরোধ রক্ষার তাগিদেই এতটা করছে তাও ভাবেনি।

···বীণার মা মারা গেল তাইতেই বা সোমার মন খারাপ হবে কি করে। যে শেষ কারণটা উপলক্ষ্য করে···শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদই ঘটে গেল এই লোকের সঙ্গে—তখনো এই মহিলার অসুখের দোহাই-ই দেওয়া হয়েছিল।

ছেলের স্কুল এসে যেতে অধঃপতনের সেই চিত্রটা মন থেকে সরিয়ে দিল সোমা। ফোঁস করে একটা গরম নিঃশ্বাস ছেড়ে দ্রুত নিজের স্কুলের দিকে পা বাড়ালো সে।

মাথার উপর সূর্য আগুন ঢালছে। গনগনে রোদ। সোমার মুখ ঘেমে লাল। ছাতা একটা আছে, কিন্তু সেটা নিতে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা ধরে চলছিল খেয়াল নেই। পিচ গলতে শুরু করেছে। এই উষ্মার মুখেই হঠাৎ মনে পড়ল ওই লোকগুলো সব খালি পায়ে শ্মশানে গেছে। সকলে কিনা জানে না, একজনের খালি পা দেখেছে। ইচ্ছে করলেই রবারের চটি পরতে পারত, কিন্তু এসব ব্যাপারে লোক-দেখানো গোঁড়ামি ষোল আনা। বেলা এগারোটা বাজে, শ্মশান থেকে ফিরতে কম করে চারটে হবে। তার পরেও কে আর খাবার সাজিয়ে বসে থাকবে! সোমার মনে হল বরুণ চক্রবর্তীর হাতে খানকতক মাছ ভেজে দিলেই হতো।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতা ছেঁটে দিতেই চেষ্টা করল। না, দয়ামায়া নয়। ওই লোককে এত চেনার পর দয়ামায়া কারো থাকতে পারে না। সোমা তার স্বভাবে এরকম ভাবে। সকলের জন্যেই ভাবতে পারে।

মন যেটুকু নরম হয়েছিল স্কুলে পা দেবার এক মিনিটের মধ্যে সেটুকু গেল। ক্লাসের ঘণ্টা বাজতে তখনো মিনিট চারেক বাকি। নমিতাদি—নমিতা বোস কাছে এসে ফিসফিস করে বলল—তোমার কে মাসিশাশুড়ি মারা গেলেন শুনলাম, তুমি আজ স্কুলে আসবে ভাবিনি।

মাসিশাশুড়ি শুনেই সোমার হয়ে গেল। খট করে জবাব দিল, আমার কেউ মারা যাইনি।

—ও মা, আজ ভোর রাতেই তো মারা গেলেন, এমন অবস্থা শুনলাম যে শব তোলার টাকা নেই হাতে—অরবিন্দবাবু নিজের মুখেই তো বললেন। আমার কাছে মাত্র দশটা টাকা ছিল তাই দিয়ে দিলাম—

নমিতা বোসের হাত দিয়ে দশ টাকা গলা সহজ ব্যাপার নয়। এত বড় উপকারের সংবাদ সে না দিয়ে পারবে কি করে! কিন্তু শোনার পর সোমার ধৈর্যের বাঁধ খানখান। কঠিন মুখে বটুয়া খুলে দশ টাকার নোটটা বার করে তার দিকে এগিয়ে দিল, ধরো—

সত্যিই নমিতা বোস হাত পেতে টাকাটা নেবে ভাবেনি। তাকে জব্দ করাই হয়তো ইচ্ছে ছিল সোমার। কিন্তু নমিতা বোস কিছুটা যেন

ঘাবড়ে গিয়েই টাকাটা নিল। মুখে বলল, এ টাকা তুমি দিচ্ছ কেন?

চাপা রূঢ় গলায় সোমা বলল, আমার মাসিশাশুড়ি যখন তুমিই বা দিতে গেলে কেন! একটা কথা তোমাকে বলে রাখি নমিতাদি, আমার মাসি-খুড়ি-পিসি কোন শাশুড়ীই নেই—এরপর টাকা দিলে আমাকে সে-কথা শোনাতে এস না।

ক্লাসের ঘণ্টা বাজল। বিপন্ন মুখে নমিতা বোস জিজ্ঞাসা করল, কেউ মারা যায়নি বলছ?

—গেছে। আমার মাসি-খুড়ি-পিসি কেউ মারা গেলে তোমার যেমন শাশুড়ি হত, সে-রকম কেউ।

হন হন করে সোমা নিজের ক্লাস ঘরের দিকে চলল।

অবিরাম জলের ফোঁটার ঘায়েও পাথর ক্ষয় হয়। সোমা তো রক্তমাংসের মানুষ। উপর্যুপরি কত আঘাত আর কত প্রবঞ্চনা সইতে পারে? জীবনে মানুষ অনেকভাবে ঠকে হয়তো, আবার সামলেও নেয়। কিন্তু অস্তিত্ব নির্মূল হয়ে যাবার মতোই প্রবঞ্চনার গহ্বরে কেউ যদি টেনে নিয়ে যায়?

সোমার জীবনে তাই ঘটেছে। একটুও কম নয় তার থেকে।

বিয়ে হয়েছিল চব্বিশের মাঝামাঝি। তেইশের মাঝামাঝি বি-এ পাশ করে ঘরে বসে ছিল। অল্প বয়সে মা মারা গেছেন। আঠের-উনিশের মধ্যে তিন দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। একটা সময় বাবার রোজগার বেশ ভালই ছিল মনে হয়। সে-সময় শস্তাগণ্ডার বাজারে ওদের বুদ্ধিমতী মা বেশ কিছু টাকার সোনা কিনে চার মেয়ের নামে ভাগ করে রেখে গেছলেন।

তখন বাবারও দরাজ হাত ছিল বেশ। প্রথম তিন মেয়ের বিয়ে মোটামুটি ঘটা করেই দিয়েছেন সত্য হালদার। কিন্তু তৃতীয় মেয়ের বিয়ের আগে থেকেই দিন পড়ে আসছিল তাঁর। নব কলোনীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ-করা ডাক্তাররা এদিকে হানা দিয়েছে। অনেক অ্যালোপ্যাথি দোকান গজিয়েছে। দেখতে দেখতে এক-একদিকের জঙ্গল সাফ হয়ে পাকা দালান উঠেছে। চলাচলের

সুব্যবস্থা হতে হু-হু করে জমির দাম চড়েছে। বর্তমানের এই বাড়ির সঙ্গেই তো আরো খানিকটা জমি ছিল। সোমার বিয়ের সময় সেই বাড়তি জমি ভালো দামেই বেচেছেন সত্য হালদার।

কিন্তু নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ার পরে এই বুদ্ধি মাথায় এসেছিল। তৃতীয় মেয়ের বিয়ের আগে থেকেই দিনকাল খারাপ। বড় রাস্তার এ-ধারে ও-ধারে আরো দু-তিনজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ডিসপেনসারি সাজিয়ে বসেছে। নামের পিছনে তারা লম্বা টাইটেল ঝুলিয়েছে। কেউ কেউ আবার প্যান্ট-কোট চড়িয়ে কদর বাড়াবার চেষ্টা করছে। বগলে ব্লাড প্রেসারের যন্ত্র নিয়ে আর গলায় স্টেথসকোপ ঝুলিয়ে রোগী দেখতে যাওয়ার ভড়ং তাদের। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এ-সব জিনিস লোকের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কি ?

কিন্তু তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে নিতান্তই কোণ-ঠাসা হয়ে পড়েছিলেন সত্য হালদার। জ্যোতিষী চর্চার ঝোঁক ছিল বরাবর। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মধ্যে এই বিদ্যেটা প্রাণপণে টেনে আনতে চেষ্টা করেছেন। এখনো তাই করছেন। দিন যতই বদলাক আর সাধারণ মানুষের চোখ যতই খুলুক, কম-বেশি ভাগ্যানুসন্ধিৎসু প্রায় সকলেই। এই দু'নৌকায় পা দিয়ে অনেক রকমের ঝোঁক-তাল সামলে সংসারটাকে একরকম করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সত্য হালদার। কিন্তু বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আর কিছুটা বা উদ্বেগের দরুণ ঝোপ বুঝে কোপ মারার বিচক্ষণতা যে কমে আসছিল এও সত্যি কথাই।

এদিকে মেয়েগুলোর বড় মন। খোলা হাত। অল্পেতে মন ওঠে না। এ জন্যে দায়ী অনেকখানি হালদার মশাই নিজেই। আকালের বাজারে তৃতীয় মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে প্রায় ফতুর হয়ে গেলেন তিনি। স্ত্রীর রাখা সোমার ভাগের গয়নাও চার ভাগের তিন ভাগই বেচে দিতে হল। মেয়েদের সান্ত্বনা দিলেন, ওকে আমি ঠকাব না, সময়ে সব করে দেব।

কিন্তু সে-সময় আর ফেরার লক্ষণ দেখা গেল না। আকাল বরং বেড়েই চলেছে। তিন মেয়ের বিয়ের পর সংসার ছোট হয়েছে, কিন্তু

তাও সামলে উঠেতে পারছেন না। নিজের অগোচরেই ভাগ্যগণনা-মিশ্রিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বোল-চালে খাদ বেড়ে চলেছে। এক লোক কতদিন ভুলবে, কতবার ভুলবে?

সোমার লম্বা গড়ন, মোটামুটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। শাড়ি ধরার ফলে ষোল না পেরুতে উনিশ মনে হয়। দিদিদের তখন থেকেই ওর বিয়ে নিয়ে চিন্তা। ঘরে মা নেই, চিন্তা স্বাভাবিক। ওদিকে দিন-কাল খারাপ, পাড়ার উঠতি মাস্তানরা আশপাশে ঘুরঘুর করে, সুযোগ-সুবিধে মতো শিসটিস দেয়। সোমার আঠেরয় পা দেওয়ার আগেই বড় দুই দিদি বিয়ের তাগিদ দিয়ে বাবাকে উত্যক্ত করতে লাগল।

গম্ভীর মুখে সত্য হালদার একদিন ঘোষণা করলেন, সোমার খুব ভালো বিয়ে হবে কিন্তু বাইশের আগে হবে না। ও বয়েসটার আগে বিয়ে দিলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে—স্বামীর দিক থেকে ফাঁড়া আছে।

ব্যস, মেয়েদের মুখ বন্ধ, তাগিদ বন্ধ।

সেই বাইশ বছরও এসে গেল একদিন। সোমা তখন উৎসুখ নেত্রে বাবার হাবভাব লক্ষ্য করে। পাড়ার কিছু কিছু ছেলেই তখন রোগী নিয়ে আসে বাবার কাছে। তাঁকে মেসোমশাই মেসোমশাই করে। ফী দিয়ে ভাগ্য গোনাবার জন্যেও খদ্দের ধরে আনে। আর ফাঁক পেলেই তারা অন্দরের উঠোনে এসে হানা দেয়। বাইরের ও-ঘরে এলেই অনেকের ঘনঘন জলতেষ্টা পায়।

সোমা মনে মনে হাসে। এ বাড়ির সঙ্গে ছেলেগুলোর অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টাটা কেন সেটা ও স্পষ্ট বুঝতে পারে। বাবা বুঝতে পারে কিনা কে জানে। একজনের কাছ থেকে দুটো চিঠিও পেয়েছিল এই সময়ে। সে-যে কার মনের কোন্ জায়গায় বসে আছে সেই ফিরিস্তি। সেই দুটো চিঠি সোমা চুপি চুপি ছোড়দিকে দেখিয়েছিল। বিয়ের পর ছোড়দিটা যে এত নীতিবতী হয়ে উঠেছে কে জানত। সে অন্য দিদিদের সেই চিঠি দেখিয়েছে, তারপর সকলে মিলে বাবার ওপর এসে চড়াও হয়েছে। বোনের বিয়ে এবারে না দিলেই নয়।

কিন্তু সত্য হালদার তখনো নির্লিপ্ত নির্বিকার। না, বাইশ

পেরুলেও ছোট মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে নেই। চব্বিশের আগে হবে না। নিজের গণনায় খটকা লেগেছে। এক ডিগ্রী আধ ডিগ্রী তফাতে দু-চার বছর এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে। নিশ্চিন্ত হতে হলে চব্বিশের ওদিকে বিয়ে দেওয়াই নিরাপদ। মেয়েদের আশ্বাস দিয়েছেন, কিছু ভাবিস না, তোদের কারো থেকে খারাপ বিয়ে হবে না ওর।

সেই বাইশ বছর বয়েস থেকেই সোমার মনে কি রকম খটকা লাগতে শুরু করেছিল। মনে হয়েছে আসলে টাকা পয়সার অভাবের দরুণ বাবা এভাবে সময় নিচ্ছে। তাছাড়া ও চলে গেলে রান্নাবান্না করে কে খাওয়াবে কে দেখবে—এই চিন্তাও বোধহয় বাবার আছে। বাবার বাইরের ঘর আর তার ভিতরের ঘরের দেয়ালের এক ধারে ছোট ঘুলঘুলি আছে একটা। এ-ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে বা রাতে আলো না জ্বেলে সেখানে দাঁড়ালে বাইরের ঘরের সব দেখা যায় কিন্তু এ-ঘরের কিছুই দেখা যায় না। সোমা অনেক সময় সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। বাবার খদ্দের আর মক্কেলদের দেখে, তাদের কথাবার্তা শোনে। বাবার চিকিৎসার ভড়ং-চড়ং দেখে আর হাসে।

এর মধ্যে কম বয়সী কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে এসে গেলে আর স্বজাতি শুনলে বাবার হাবভাব অন্যরকম। তার ঘরের যাবতীয় খবর নিতে বসে তখন। একবার একজনের ওইরকম সব খবর নেবার পর মক্কেলটি বিবাহিত শুনে বাবার মেজাজ খিঁচড়েই গেল। ঘুলঘুলির এধারে সোমা হেসে বাঁচে না।

কিন্তু তবও মুখের হাসি কমে আসতে লাগল ক্রমশ। বয়েস চব্বিশে এসে ঠেকল। বি-এ পাশ করে ঘরে বসে আছে। এম-এ পড়ার ইচ্ছে বাবাই বাতিল করে দিয়েছে। আসল কারণ এম-এ পাশ করলে বিয়ে দেওয়া শক্ত হবে—এই জন্যে। কিন্তু বিয়ে নিয়েও তাকে তেমন উঠে পড়ে লাগতে দেখছে না। আগের সন্দেহটাই বদ্ধমূল এখন। প্রথম কথা টাকা নেই, দ্বিতীয় ও শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে তার চলবে কি করে। ঠিকুজী গণনার ফাঁড়া এবারে চব্বিশ থেকে ছাব্বিশে গড়ালেও আশ্চর্য হবে না।

ঠিক এই সময় আর একজনের আনাগোনা শুরু হল বাড়িতে। এমনিতে নম্র-সম্র ভদ্র কিন্তু মুখে বিচ্ছিরি গোটাকতক বসন্তের দাগ। বরুণ চক্রবর্তী। মায়ের চিকিৎসার কারণে প্রথম পদার্পণ এ-বাড়িতে। ফী গুণে বাবাকে তিন-চারবার দেখাতে নিয়ে গেছল। সেই মা চোখ বুজেছে। তারপরেও বাবা তাকে যখন-তখন বাড়িতে ধরে নিয়ে এসেছে। কোনোদিন অন্দরে এনে বসিয়েছে। সোমাকে চা করতে বলেছে। কখনো বা প্রায় অকারণেই বাইরের ঘরে সোমার ডাক পড়েছে। বাবা ডেকেছে।

তারপর বাবাই একদিন হঠাৎ ওকে বলেছে, এ ছেলেটা মন্দ নয় বুঝলি। বি-এ পাশ, বেশ ভদ্র ছেলে। চাকরি জোটাতে না পেরে এখন ব্যবসা শুরু করেছে। আর খুব উদ্যমী ছেলে। দু' পয়সা কামাচ্ছেও। মূলধনের জোর থাকলে আরো বেশি রোজগার হত—আস্তে আস্তে হবেও।

একে মুখে বসন্তের দাগ তার ওপর কিসের ব্যবসা ওই ছেলের শুনে তো চক্ষুস্থির সোমার। মাছের ব্যবসায় রোজ রাত বারোটায় ক্যানিং-এর বাজারে হাজিরা দেয়। সেখানে মাছের ডাক হয়। নৌকায় আর লঞ্চে সেইসব মাছ আসে মাতলা নদী দিয়ে। যার যেমন টাকার জোর সে সেইরকম মাছ ডেকে নেয়। বড় ব্যাপারীরা মাছ ডেকে নিয়ে ট্রেন বা লরি করে সেই মাছ সকালের মধ্যে শহরের নানা জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। এই ছেলের সেই সংগতিও নেই। মাছ কিনে কুলির মাথায় বা ঠেলায় চাপিয়ে এখানে-সেখানে পাঠায়। নয়তো ভাগে লরি বা ট্রেন ভাড়া করে।

বাবা শেষকালে ভদ্রঘরের একজন জেলে ধরবে ছোট মেয়ের জন্য এ সে কল্পনাও করেনি। বাবার আসল মতলবটা বুঝেই ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে লেগেছিল সোমা। এখানে ছোট একটা ঘরভাড়া করা আছে ওই ছেলের। বিয়ে হলে সেটাও আর রাখার দরকার নেই—জামাই এ-বাড়িতেই থাকতে পারবে। সোমার তাহলে কোনদিন এ-বাড়ি থেকে নড়ার প্রশ্নই ওঠে না। বাবা এইভাবেই নিশ্চিন্ত হতে চায়।

মুখে বাবাকে কিছু বলতে পারেনি সোমা। কিন্তু আচরণে মনোভাব বোঝাতে কসুর করেনি। এক ঝটকায় উঠে চলে গেছল সেদিন। পরেও ঘরে ডাক পড়লে বাইরে থেকে সাড়া দিয়েছে, ভিতরে ঢুকতে চায়নি। কিন্তু এও জানে বাবার মাথার একবার কোনো সঙ্কল্প ঢুকলে সেটা হটানো শক্ত। বাবা ঠিক তার নিজের বিবেচনার রাস্তা ধরেই এগোবার মতলবে আছে।

এমন দিনে আর একজনের আবির্ভাব। অরবিন্দ গাঙ্গুলি। বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গেই এ-বাড়িতে প্রথম পদার্পণ তার। ছেলেবেলার বন্ধু তুজনে। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে, একসঙ্গেই হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছে। কলেজে উঠে ছাড়াছাড়ি। ছাড়াছাড়ির কারণ অরবিন্দ গাঙ্গুলির দাদারা দূরের শিয়ালখেদা কলোনীতে নাকি মস্ত বাড়ি হাঁকিয়ে বসেছিল। অরবিন্দ গাঙ্গুলি তখন সেদিকের কোনো কলেজে নাম লিখিয়েছে। সেই থেকে দীর্ঘকাল তুজনের ছাড়াছাড়ি একরকম। এই নব কলোনীতে এসে আবার যোগাযোগ। বরুণ চক্রবর্তী নিজেই গল্প করেছে স্কুলে অরবিন্দ নাকি তার থেকে ঢের ভালো ছাত্র ছিল।

রাস্তায় বেরিয়ে এই লোককে সোমা এর মধ্যে অনেক দিন বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে গল্প করতে দেখেছে। ও পাশ কাটিয়ে যেতে তুজনেই লক্ষ্য করেছে ওকে। সোমা তাকে একলাও দেখেছে অনেক সময়। এপাড়ার অ্যালোপ্যাথি দোকানগুলোতে তার বেশি যাতায়াত। হাতে মস্ত একটা ব্যাগ থাকে তখন। পরনের পোশাক-আশাক বেশ শৌখিন। চকচকে প্যান্ট-শার্টে ঢ্যাঙা লোকটাকে মন্দ দেখায় না! গায়ের রং কালো কিন্তু মুখখানা সুশ্রী। আর সর্বদা হাসিমাখা তুটো চোখ। বরুণ চক্রবর্তীর বন্ধু জানার আগেও যাতায়াতের পথে অনেকদিনই তাকে দেখেছে সোমা। আর ওই লোকও যেন প্রায় পরিচিতের মতোই মুখ তুলে তাকিয়েছে ওর দিকে।

তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে স্পষ্ট একটা অভিসন্ধি নিয়েই বন্ধুর সঙ্গে এ-বাড়িতে মাথা গলিয়েছে সে। আর সোমারও তুর্ভাগ্য নইলে পিছনের ঘুলঘুলিতে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে আলাপচারীর আধ

ঘণ্টার মধ্যেই তাকে এত ভালো লেগে যাবে কেন? সব থেকে গোল পাকিয়েছে সপ্রতিভ মুখের ওই হাসিমাখা চাউনিটা।

বন্ধুর সঙ্গে এসেই বাবার পায়ের ধুলো নিয়েছে। বাবা ব্যস্ত হতে বলেছে—বাধা দেবেন না, পায়ে হাত দেবার মতো লোক এমনিতেই কমে আসছে।···বরুণের মুখে অনেকদিন আপনার গল্প শুনেছি, আসি-আসি করেও এতদিন হয়ে ওঠেনি, দিন মজুরি করে খাই তো।

সত্য হালদার বলেছেন, কিছুকাল যাবত তোমাকে আমি এদিকে দেখছি বটে···কি করো বাবা তুমি?

হেসে জবাব দিয়েছে, ওষুধের দালালী। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন-টেটিভ।

—পাকা চাকরি কিছু না বুঝি?

—চাকরি পাকাই তবে ধকল অনেক—দিন-রাত ছোটাছুটির ব্যাপার।

এরপর বড় একটা কোম্পানীর নাম করেছে—তাদের সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি এই এলাকার ফিলড অর্গানিজেশনের জন্য তাকে এদিকে টেনে আনা হয়েছে। চারদিকে নতুন কলোনী গজিয়ে উঠেছে—ফিলড ওয়ার্ক দরকার। এরই মধ্যে মফঃস্বলে ছুটতে হয় মাঝেমধ্যে।

অ্যালোপ্যাথির বাজার যারা জাঁকিয়ে তুলতে চায় সত্য হালদারের তাদের প্রতি খুব খুশি হবার কথা নয়। ফোঁস করে বলে ফেলেছেন, যেভাবে তোমরা সর্ব দিক দখল করে বসছ আমাদের আর খেয়ে-পরে থাকতে হবে না।

সপ্রতিভ বিনয়ে সম্ভাবনাটা খণ্ডন করতে চেয়েছে। বলেছে, এটা কিন্তু ঠিক কথা হল না—আমেরিকা ইয়োরোপ থেকে হোমিওপ্যাথির বাজার উঠে যেত তাহলে—যে-সব জায়গা থেকে অ্যালোপ্যাথির বিরাট বিরাট আবিষ্কার সেখানেই আবার হোমিওপ্যাথির বাজার তাদের ওপর টেক্কা দিয়ে চলেছে। আসলে সব কিছুর জন্যেই কিছু ফিলড ওয়ার্ক দরকার, কিছু চমক দরকার—এখনকার হোমিও-প্যাথিতে সেটার অভাব। বেশ মিষ্টি হেসেই ঠোঁট কাটার মতো বলেছে

তারপর, এই যে আপনি এতবড় একজন গুণী ডাক্তার, আপনার এই দপ্তর দেখলে সেটা যারা আপনাকে চেনে না জানে না তারা কি করে বুঝবে ? অথচ এরই একটু ভোল বদলে নিয়ে চ্যালেঞ্জ রেখেই ছ'মাসের মধ্যে আপনার ক্লায়েন্ট আমি দ্বিগুণ করে দিতে পারি। আপনার তো তার ওপর আবার জোতিষী জানা আছে—রোগীরা আপনার কাছে এসে কিউ দিয়ে দাঁড়ায় না কেন আমার মাথায় আসে না।

কথাগুলো কান পেতে শোনার মতো মনে হয়েছে সোমার। স্পষ্ট কথাগুলো শোনার পর বাবার ভিতরে ভিতরেও একটু বোধহয় আশার উদ্রেক হয়েছিল। তার ওপর বরুণ চক্রবর্তীর মন্তব্যেও কিছু কাজ হয়েছে। সে বলেছে, অরু চেষ্টা করলে সত্যিই অনেক কিছু পারে। পরে বন্ধুকেই বলেছে, তোর তো এই ছ'মাসের মধ্যেই অনেক লোকের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে দেখছি। কতজনের জন্যে কত কি করে বেড়াস —এঁর প্র্যাকটিস যাতে বাড়ে একটু, সে চেষ্টা কর না।

অম্লান বদনে মাথা নেড়েছে, আচ্ছা করব।

সত্যি কিছু করতে পারে সোমা অন্তত বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ওই প্রত্যয়টুকু ভালো লেগেছে।

বাবাকে বন্ধুর কৃতিত্বের একটা নজির শুনিয়েছে বরুণ চক্রবর্তী। এই এলাকার একটা পরিচিত ওষুধের দোকানের নাম করে বলেছে তাদের একগাদা ওষুধ ডেড স্টক হয়ে গেছল আর লোকসান খাচ্ছিল। অরুকে এসে ধরে পড়ার সাতদিনের মধ্যে ও সমস্ত মাল খালাস করে এনে দাম চুকিয়ে দিলে—অবশ্য অরুরও তাতে মোটা লাভ হয়েছিল।

অতএব সত্য হালদার এবারে ভালো করে লোকটার খবরাখবর নিতে লাগলেন। নামধাম আগেই শোনা হয়েছিল। এবারে বাড়ির খবর নিতে লাগলেন। কে আছে না আছে, দাদারা কি করে— শিয়ালখেদার পৈতৃক বাড়ির অবস্থা কি, ইত্যাদি।

পারিবারিক প্রসঙ্গে মানুষটাকে কিছুটা নির্লিপ্ত মনে হয়েছিল সোমার। বলেছে শিয়ালখেদার পৈতৃক বাড়িটাকে সেখানকার লোকে বড়বাড়ি নাম দিয়েছে। কিন্তু তার ও-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই

বললেই চলে। সপরিবারে দুই দাদা থাকে। সেখানে ক্ষেতের জমি আছে, চাষাবাদ আছে, সুখে-শান্তিতে আছে দাদারা—তার মধ্যে সে গিয়ে পড়লে তারা উপদ্রব ভাবে। হাসতে লাগল।

চোখ-কান কাটার মতো বাবা জিজ্ঞাসা করে বসলেন, যে কাজ করছ তুমি তাতে মাইনেপত্র কি রকম ?

তরল গলায় জবাব দিল, আমাদের কোম্পানী বেশি কাজ চায়, বেশি টাকা দিয়ে কারো স্বভাব-চরিত্র খারাপ করে দিতে চায় না। ন'শ দিচ্ছে এখন, এবারে আলটিমেটাম দেব ভাবছি।

ন'শ শুনেই সত্য হালদারের চোখ বড় বড়। তার ওপর বরুণ চক্রবর্তী বলল, ন'শ বলছিস কেন, বিক্রীর ওপর কমিশন তো আছে—

অরবিন্দ গাঙ্গুলি জবাব দিল, ওটুকুও না থাকলে তো কবেই ছেড়ে-ছুড়ে দিতাম—

বাবার পরের প্রশ্নটা শুনে ঘুলঘুলির এধারে সোমা উদগ্রীব একটু। মন্তব্যের সুরে বাবা প্রথমে বললেন, খুব ভালো, এতেই লেগে থাকো। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তা বাবা তুমি পড়াশুনা কি করেছ ?

জবাব দিল, আসল পড়াশুনার সময় যখন তখনই তো রোজগারের ধান্দায় চাকরিতে ঢুকে পড়তে হল। এম-এসসি পাশ করেছিলাম, রিসার্চের ইচ্ছে ছিল তার বদলে ওষুধ বিক্রির রিসার্চে ঢুকে গেলাম।

নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না সোমা। কিন্তু এম-এসসি পাশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের তলায় যেন ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেছল তার। ও-যেন কিছু একটা সম্ভাবনার গণ্ডীর মধ্যে পা ফেলে দাঁড়াল।

ছেলেটা এম-এস-সি পাশ এ সত্য হালদারও ভাবতে পারেননি। বলে উঠলেন, তাহলে কোনো কলেজ-টলেজে না ঢুকে এ চাকরি করতে এলে কেন ?

ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে হাসিমাখা চাউনিটা ডবল সুন্দর লাগল সোমার। জবাব শুনেও খুশিভরা মুখের ওপর আঁচল তুলতে হল। হেসে বলছে, আপনি তো দেখি ম্যাজিস্ট্রেটকে দারোগা হবার আশীর্বাদের

মতো বলছেন। মাইনে ছেড়ে ওষুধ বিক্রীর কমিশন যা পাই তাই দিয়ে কলেজের দুটো মাস্টার রাখা যায়।

বাবাকে লজ্জা পেতে দেখল সোমা। সঙ্গে সঙ্গে অতিথিকে চা দেবার তাগিদও অনুভব করল বাবা। ভিতর থেকে ডাক এলো, কই রে সোমা, দু' পেয়ালা চা এনে দে তো চট করে—

সোমার মুখ লাল।

ওদিকে অরবিন্দ গাঙ্গুলি বলল, না, চা না, আমার আবার গ্যাস-ট্রিকের ট্রাবল আছে—খাওয়া-দাওয়ার সময়ের ঠিক নেই তো কিছু—

সত্য হালদার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, সে কি কথা, এই বয়সে এসব রোগ—চিকিৎসা করাও না কেন?

—করি। আমাদের ওষুধের বেশির ভাগ তো ভাঁওতাবাজী। আচ্ছা এর ভালো ওষুধ আছে আপনাদের শুনেছি?

সত্য হালদার সাগ্রহে বলেছেন, তা তো আছে, কিন্তু বিশ্বাস নিয়ে আমাদের চিকিৎসা কি তোমরা করবে।

—বিশ্বাস! অবাক যেন।—ওষুধের আত্মিক শক্তি একমাত্র হোমিওপ্যাথিতেই আছে এ সকলেই জানে—আমার বাবা আজীবন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে গেছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসার পিছনে এই ইচ্ছেটাও ছিল।

অতএব সত্য হালদার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এতদিনে এই একটাই যেন সমঝদার রোগী হাতে পেয়েছেন। প্রশ্ন করে করে রোগের বিবরণ জেনে নিতে লাগলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীর সহযোগিতা কি-রকম দরকার তাও জানে ছেলেটা। সেইরকম করেই নিজের সম্পর্কে হদিস দিতে লাগল।

বেশ ভেবেচিন্তে ওষুধ ঠিক করলেন সত্য হালদার। সাতটি পুরিয়া দিলেন। সাতদিন খেতে হবে। আর নির্দেশ মতো খাওয়া-দাওয়া নিয়মমাফিক করতে হবে।

পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে সামনে রাখতে গেল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। টাকা দেখে এই প্রথম বোধ করি হাঁ-হাঁ করে

উঠলেন সত্য হালদার। কিন্তু অরবিন্দ গাঙ্গুলি জোর করেই টাকাটা সামনে রাখল, বলল, ফী আপনাকে দিচ্ছি না, আপনি গুরুজন আর বরুণের সুবাতে আপনার জন—প্রথম দিন অন্তত এ টাকাটা প্রণামী হিসাবে নিতে হবে—না নিলে আর আসব না।

হাসিমুখে ওষুধ নিয়ে উঠে দাঁড়াল।—বরুণ, তুই বোস, আমার এক্ষুণি না ছুটলে অনেক কাজ পণ্ড।

চলে গেল।

সত্য হালদার মুগ্ধ। আব ঘুলঘুলির ও-ধারে মুগ্ধ তাঁর থেকে বেশি সোমা। রাস্তায় যখন দেখেছে তখনো এত বিদ্বান আর এরকম মানুষ ভাবতে পারেনি। তার মুখে 'বরুণের সুবাতে আপনার জন' কথাটা একটুও ভালো লাগেনি। বসন্তের দাগ-মারা ওই মুখটা কুৎসিত লাগছে এখন। কিন্তু এই মানুষও বন্ধুবৎসল বটে। বাবার প্রশংসার জবাবে সায় দিয়ে নিজেও বন্ধুর সুখ্যাতিই করেছে। বলেছে—লোকটার দরাজ হাত, দরাজ মন—বিপাকে পড়ে কেউ কিছু চাইতে এলে কক্ষণো নিরাশ হয়ে ফেরে না—নিজে এগিয়ে এসে কত লোকের উপকার করে ঠিক নেই।

শুনে সোমার মনে হয়েছিল দু' কান জুড়িয়ে গেল।

ঠিক সাতদিন বাদে অরবিন্দ গাঙ্গুলি একলাই এলো। খুশিতে আটখানা মুখ। এসেই ঝুপ করে বাবার পায়ের ধুলো মাথায় নিল। বলল, আপনাকে আর এ-রকম ছাইচাপা হয়ে পড়ে থাকতে দেওয়া হবে না।

এ সাক্ষাৎকার অন্দরের উঠোনে। বাইরে থেকে একটা হাঁক দিয়ে ঘরের ছেলের মতো সোজা ভিতরে চলে এসেছে। অদূরের দাওয়ায় সোমা দাঁড়িয়ে। তাকে দেখামাত্র মুখ লাল।

হাসিমুখে সত্য হালদার জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল আবার?

—আপনার ওষুধকে ওষুধ বলব না চাবুক বলব? পেটে জ্বালা নেই, চোঁয়া ঢেঁকুর নেই—একটা খাই-খাই ভাব।

সত্য হালদার বিগলিত।—সত্যি বলছ না বাড়িয়ে বলছ?

—বাড়িয়ে! রোগী কখনো বাড়িয়ে বলে? সর্বদা শুনবেন, তেমন কিছু হল না, আরো ভালো কিছু ওষুধ দিন। সোমার দিকে ঘুরে তাকালো।—আজ আমার দু' পেয়ালা চা চাই, সেই সঙ্গে মুড়ি বা বিসকুট-টিসকুট যদি কিছু থাকে দেবেন—অন্য কিছু না।

সত্য হালদার ব্যস্ত হয়ে বললেন, চা বানা, চা বানা, আর ভালো বিসকুট তো ঘরেই আছে—আছে না? সোমা মাথা নেড়ে সায় দেবার আগেই আবার বললেন, এটি আমার মেয়ে সোমা, এ বছর বি-এ পাশ করেছে।

—আমি সব জানি। অনেক দিন দেখেছি আর বরুণের মুখেও এঁর কথা শুনেছি। হাসিমাখা চাউনিটা এবারে সোজা সোমার মুখের ওপর।—পড়াশুনার চাপ যখন নেই আপনি তো বেকার। আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?

থতমত খেয়ে সোমা মাথা নাড়ার আগেই সত্য হালদার বললেন, ওকে তুমি আপনি-আপনি করছ কেন—ও আবার তোমাকে কি সাহায্য করবে?

একমুখ হেসে অরবিন্দ গাঙ্গুলি জবাবটা সোমাকেই দিল, সাহায্যের পরোয়ানা পেয়েই গেছি তাহলে। তুমি চা বিস্কুট নিয়ে এ-ঘরে এসো, তোমাতে আমাতে মিলে একটা ষড়যন্ত্রে বসব—এভাবে আর হালদার মশাইকে ভোলানাথের মতো ছাই মেখে বসে থাকতে দেওয়া হবে না।

সত্য হালদারের মুখে খুশি ধরে না। সাদরে তাকে বাইরের ঘরে এনে বসালেন। আর নতুন ওষুধ দেবার সঙ্কল্পে আগে বার বার রোগের খবর নিতে লাগলেন।

সোমা চটপট চা করে ফেলল। ডিসে বিসকুট সাজালো। বুকের তলায় কি এক নতুন বাতাস লেগেছে যেন। লোকটার কথাবার্তার মধ্যেও এক ধরনের স্পর্শ আছে। বলল কিনা, তোমাতে আমাতে মিলে একটা ষড়যন্ত্র করব!…ওর সম্বন্ধে বরুণ চক্রবর্তীর মুখে অনেক শুনেছে। কি এমন অনেক শুনতে পারে? লোভীর

মতো কোনো সম্ভাবনার আঁচ দেয়নি তো। বেচারা বরুণ চক্রবর্তীর ওপর অকারণেই রাগ হচ্ছে তার।

চা-বিসকুট খেতে খেতে সত্য হালদারের সামনেই অরবিন্দ গাঙ্গুলি তার মতলব ফাঁস করেছে। সব কিছুরই একটা শো চাই আজকের দিনে, নইলে কেউ গুণের কদর করে না। প্রথমেই দরজার সামনে ঝকমকে সাইনবোর্ড বসাতে হবে একটা, ছোট ছোট আরো দুটো অন্তত ওষুধের আলমারি আনাতে হবে। পুরানো আসবাব যা আছে সেগুলো রং পালিশ করাতে হবে, নতুন আসবাবও কিছু চাই।

সত্য হালদার হাঁসফাঁস করে উঠেছেন।

—এতসব করতে হলে অনেক টাকা লাগবে তো!

—কি-চ্ছু লাগবে না। সব আপনার বাড়তি রোজগার থেকে কাটান দেবেন। না হয় কিছু সুদও ধরে দেবেন আমাকে। হেসে উঠেছে।—শোনো সোমা। ওনার কথা মতো ওষুধের গ্রুপ করে করে তুমি আলমারিতে সাজাবে, লেবেল আঁটবে—আসবাবপত্র কোথায় কি বসবে না বসবে দুজনে মিলে ঠিক করবখন। কি মনে পড়তে হালদার মশাইএর দিকে ফিরেছে আবার।—আপনার ভালো স্টেথসকোপ নেই—না?

মুখ কাঁচুমাচু করে সত্য হালদার জবাব দিয়েছেন, একেবারেই নেই—ওসব ব্যবহার করতেও জানি না।

—জানার দরকার নেই, আপনি যা জানেন সেই দাম দেয় কে। ···তবু আকাট মুখখুগুলোর জন্যেই স্টেথো একটা দরকার। ঠিক আছে, আমার অনেক চেনাজানা দোকান আছে, ঝকঝকে দেখে একটা এনে দেবখন।

পনের দিনের মধ্যে বাইরের ঘরের ভোল বদলে গেছে সত্য হালদারের। সামনে ঝকমকে সাইনবোর্ড ঝুলেছে, দেয়ালে দু-দুটো টিউবলাইট বসেছে। ছোট ছোট নতুন দুটো কাচের আলমারি আর কিছু নতুন আসবাব এসেছে। পুরানো চেয়ার-টেবিল আর বেঞ্চ রং-পালিশ করা হয়েছে। সত্য হালদারের গলায় স্টেথসকোপও

ঝুলতে দেখা যাচ্ছে একটা।

বাইরের একটা ছেলে কত সহজে কত কি যে করে ফেলতে পারে বাপ আর মেয়ে তাই দেখছে চেয়ে চেয়ে। শুধু তাই নয়, রাতারাতি ভাগ্যটাও যেন বদলাতে শুরু করেছে সত্য হালদারের। অরবিন্দ গাঙ্গুলি রোগী ধরে নিয়ে আসে। দূরের রোগীরাও ওই লোকের নাম করে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে। চিকিৎসার সঙ্গে জ্যোতিষী মেশানোর ফলেও তাদের অনেকে ঘায়েল।

হ্যাঁ, রাতারাতি সুদিনের স্বপ্ন দেখতে লেগেছেন সত্য হালদার। এত বয়েস্ পর্যন্ত এরকম একটা ছেলে তিনি আর দেখেন নি। কিছু বললে ছেলেটা যা জবাব দেয় তা শুনেও দু' কান জুড়োয়। সত্য হালদার সেদিন বলেছিলেন, এ জন্মে আমার ছেলে নেই, কিন্তু আর জন্মে তুমি বোধহয় আমার ছেলেই ছিলে বাবা—

মিটিমিটি হেসে অরবিন্দ গাঙ্গুলি জবাব দিয়েছে, এ-জন্মেও আপনার ছেলেই ভেবে নিন তাহলে—

সে-কথা শুনেও সোমার মুখ লাল। বোকা কেউ বলবে না তাকে। বরুণ চক্রবর্তীর মুখে শুনেছে আর নিজেরাও দেখছে পরের উপকার করে বেড়ানো একটা নেশার মতো এই লোকের। কিন্তু নেশা ছাড়াও কিছু অনুভব করতে পারে সোমা। ও সামনে না থাকলে মানুষটা উসখুস করতে থাকে, সময় সময় নিজেই হাঁকডাক করে ডাকে। রান্না বা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলে বাবাকে নিয়ে বা বাবার দপ্তর নিয়ে কিছু একটা আলোচনার দরকার হয়ে পড়ে। ভিতরে এসে একটা পিঁড়ি বা মোড়া টেনে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়ে। দু-তিনবার করে চায়ের তেষ্টা পায়।

সোমা সেদিন বলেছে, এতবার করে চা খাচ্ছেন, আপনার না গ্যাসট্রিক!

তক্ষুণি জবাব দিয়েছে, তোমার বাবার ওষুধে গ্যাসট্রিক-ফ্যাসটিক সব ছাই হয়ে গেছে।

বাবার ওষুধের এত কদর আর বোধহয় কারো মুখে শোনেনি সোমা।

বাবাকে আড়াল করে সিগারেট খাবার জন্যেও মাঝে মাঝে উঠে ভিতরে চলে আসে। কিন্তু সোমা ঠিক লক্ষ্য করেছে বাইরের ঘরে ও কাছে থাকলে দেড়-হু'ঘণ্টা কেটে গেলেও সিগারেটের নেশায় ঘর ছেড়ে নড়ে না। নিজের ভিতরেও অদ্ভুত একটা পরিবর্তন টের পাচ্ছে সোমা। ওই লোক হুদিন না এলে ভিতরে ভিতরে উন্মুখ হয়ে ওঠে। তারপর হঠাৎ তার গলা পেলে নিজের মধ্যেই কি রকম একটা সাড়া জাগে।

॥ তিন ॥

গাছ-কোমর শাড়ি জড়িয়ে পাট জড়ানো লম্বা সরু বাঁশের খোঁটা দিয়ে ঘরের ঝুল ঝাড়ছিল সোমা। নোংরা ঘর-দোর দেখতে পারে না। মাঝে মধ্যে নিজেই এ-সব কাজ করে। কিন্তু গত হু' মাসের মধ্যে বাবার দপ্তরের ভোল বদলানোর কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিকে মন দিতে পারে নি। অরবিন্দ গাঙ্গুলি দিন তিনেকের জন্য মফঃস্বলে গেছে, আগামীকাল ফেরার কথা। অতএব হুট করে অন্দরমহলে কারো এসে পড়ার সম্ভাবনা নেই ধরে নিয়ে সোমা ঘর সংস্কারের কাজে মন দিয়েছিল। কাপড়ে আর মুখে কালি-ঝুলি লেগেছে, একটু বেশি পরিশ্রমের ফলে সোমা অল্প অল্প ঘামছেও।

দরজার ওধারে গলা শুনে ধড়ফড় করে উঠল। হাতের বাঁশ ফেলে তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল কোমর থেকে খুলে গায়ে জড়াতে জড়াতে দেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে অরবিন্দ গাঙ্গুলি। লজ্জা পেয়ে সোমা বলল, আপনার তো কাল আসার কথা ছিল?

হাসি মুখেই সায় দিল অরবিন্দ গাঙ্গুলি, বলল, তাই ছিল কিন্তু ভাগ্য কাড়বে কে—কাল এলে এ-রকম একটা দৃশ্য চোখে দেখতে পেতাম না। বরুণটার বরাত দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।

বরুণ চক্রবর্তীর কথা বলে আগেও এক আধ সময় ঠাট্টা-তামাসা করেছে। কিন্তু এ-রকম সরাসরি ইঙ্গিত এই প্রথম। ভিতরে ভিতরে সোমা বেশ একটা ধাক্কা খেল। আর রাগও হয়ে গেল খুব। বাবা

কিছু বলেছে না বরুণ চক্রবর্তী নিজেই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কিছু আঁচ দিয়েছে জানে না। কোন্ তাগিদে যে এর একটা বিহিত করতে চাইল সোমা সেটা নিজেরও অগোচর নয় খুব। গম্ভীর মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, বরুণবাবুর বরাতের কি হল, ব্যবসার উন্নতি-টুন্নতি হল হঠাৎ?

অরবিন্দ গাঙ্গুলি হাসি মুখেই জবাব দিল, না ব্যবসার কথা কে বলছে।

সোমা এবার ফস করে যে-কথা বলে বসল সে-রকম বলার মেয়ে নয়। কিন্তু উষ্মার একটা চাপা ঝাপটা যেন আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। বলল, আপনার বন্ধুকে অত বেশি দিবাস্বপ্ন দেখতে বারণ করে দেবেন।

বলেই বাঁশের কোটা হাতে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেছে। ঘুরে তাকালে ওই লোকের হাসি-মাখা দু' চোখ আনন্দে বিস্ফারিত দেখতে পেত।

সোমার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বেচারা বরুণ চক্রবর্তীর ওপর। না, বাবা কিছু বলে নি নিশ্চয়, কারণ বাবা ইদানীং এই একজনের প্রশংসাতেই পঞ্চমুখ সর্বদা। বাবা নিজের স্বার্থ বোঝে না এ অপবাদ কেউ দেবে না। তাহলে? তাহলে ওই বরুণ চক্রবর্তী নিজেই কিছু না কিছু বলেছে বন্ধুকে। তা না হলে সে এরকম ঠাট্টা করতে যাবে কেন?

এর পর আরো একটা তুচ্ছ কারণে ওই বরুণ চক্রবর্তীর ওপব সোমার বিরূপতা বেড়েই গেল। প্রশংসার সুরে বন্ধুর অমানুষিক পরিশ্রমের কথাই বলছিল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। রোজ রাত বারোটায় সেই ক্যানিং-এর বাজারে গিয়ে হাজিরা দিতে হয়। তারপর মাছ ডাকা, মাছ পাঠানো—রাতে বেচারা দু' ঘণ্টাও ঘুমনোর সময় পায় কিনা সন্দেহ। অত খাটছে অথচ ক্যাপিটালের অভাবে বড় করে কিছু করতেও পারছে না, ইত্যাদি।

সোমা তখন ঘরে বসে। নিস্পৃহ মুখে বাবা বলল, এ-রকম করলে তো স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে, তোমার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব তোমার লাইনেই কিছু করলে পারত—ও-রকম একটা ব্যবসা মাথায় চাপল কেন?

অরবিন্দ গাঙ্গুলি জবাব দিল, আমাদের লাইনে চেষ্টা করার কথা ভেবেছিলাম···ওষুধ কেনা-বেচা করতে পারে কিন্তু গ্র্যাজুয়েট না হলে চাকরি জোটানো শক্ত—হয়ই না।

শুনে সোমা অবাক একটু, আরো বেশি অবাক সত্য হালদার।

—বরুণ তো বি-এ পাশ শুনেছিলাম !

অরবিন্দ গাঙ্গুলি হকচকিয়ে গেল একটু। —কোথায় শুনেছিলেন ?

—কোথায় শুনেছিলাম···ও তো বোধহয় নিজেই বলেছিল, হ্যাঁ বরুণ নিজেই বলেছিল পাস কোর্স-এ বি-এ পাশ করার দরুণ নাকি আর পড়া হল না আর চাকরিরও তেমন সুবিধে হল না।

অরবিন্দ গাঙ্গুলির মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেছে। হেসেই ফেলল। পরে বলল, মাঝে তো আমার বেশ কয়েকটা বছর ছাড়াছাড়ি—হতে পারে, আমি ঠিক জানি না। পরক্ষণে দু হাত জোড় করে অনুনয়ের সুরে বলল, কিন্তু কথা দিন এ নিয়ে আপনি ওকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করবেন না, মাঝখান থেকে আমি অপ্রস্তুতের একশেষ হবো।

যে-টুকু বোঝাবার বাবা মেয়ে দুজনেই বুঝে নিল। তার হাঁসফাঁস দশা দেখে সত্য হালদার বললেন, ঠিক আছে বলব না, কিন্তু আমার কাছে এ-রকম একটা মিথ্যে কথা বলে গেল !

—মিথ্যে তো আমি বলি নি। হাতে পারে, বি-এ পাশ করতে এমন আর কি লাগে। তা যে পাশই হোক, ওর মতো ছেলে হয় না এ আপনি আমার কাছ থেকে জেনে রেখে দিতে পারেন।

ছেলে যে কার মতো হয় না সেটা বাবা আর মেয়ে খুব ভালো করেই অনুভব করেছে। না এরপর বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে বাবা বা মেয়ে মুখে কিছু অশোভন ব্যবহার করেনি অথবা ও-ব্যাপারে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেনি। কিন্তু এ-বাড়িতে তার কদর দ্রুত কমে আসছে। অরবিন্দর সঙ্গে না এলে এক পেয়ালা চা-ও জোটে না।

এর পর আর এক ব্যাপার ঘটে গেল যার ফলে ওই বরুণ

চক্রবর্তীর ওপর বাবা মেয়ে আরো নিস্পৃহ। প্রায় বিরূপই বলা যেতে পারে। মোটা ব্যাগ হাতে ফিটফাট পোশাকে অরবিন্দ গাঙ্গুলি ঘরে ঢুকেই খোঁজ করল, বরুণ এসেছে?

গলা পেয়ে সোমা বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল। সত্য হালদার বললেন না, তো—তার এখানে আসার কথা নাকি? বোসো—

—বসার সময় নেই। কৃষ্ণনগর ছুটতে হবে এক্ষুণি, আজ ফিরব কিনা ঠিক নেই। কোনো সময়ের জ্ঞান যদি থাকত ওটার, ঠিক সাড়ে সাতটায় এখানে মিট করব বলেছিলাম, এখন পৌনে আটটা। যাক, আপনি একটা কাজ করবেন তো—

হাত ব্যাগ চেয়ারে রেখে প্যান্টের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করল। গুনে পাঁচখানা দশ টাকার নোট সরিয়ে রেখে বাকি টাকা সত্য হালদারের দিকে বাড়িয়ে দিল। —ও এলে এই সাড়ে সাতশ টাকা ওকে দিয়ে দেবেন তো—

সত্য হালদার অবাক। —কিসের টাকা?

—বরুণের দরকার। ক্যাপিটালের অভাবে বেচারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, ক্যানিং-এর বাজারে গিয়ে মাঝারি ডাকগুলোও ছেড়ে দিতে হচ্ছে—বলেছিলাম যা পারি দেব—এর বেশি আপাতত পারা গেল না। টাকাগুলো হালদার মশাইয়ের সামনে পেপার ওয়েট চাপা দিল।—ওকে দিয়ে দেবেন, আমার দেরি হয়ে গেছে, চললাম—

হালদার মশাই বাধা দিলেন তবু, এতগুলো টাকা দিচ্ছ, ফেরত পাবে?

অরবিন্দ গাঙ্গুলি নিশ্চিত খুশি মুখে তড়বড় করে বলল, সে-জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না,—বরুণের কাছে টাকা থাকা ব্যাঙ্কে রাখার সামিল, চলি—

চলে গেল। বাবা মেয়ে দুজনেরই মনে হল বন্ধুত্বের সুযোগ নিচ্ছে ওই বরুণ চক্রবর্তী।

মিনিট চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বাদে বরুণ চক্রবর্তী এসে হাজির। এবারে আর সোমা বাইরে এসে দাঁড়াল না। কেন যে লোকটাকে

দেখলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ইদানীং জানে না। দেয়ালের ওধারে ঘুলঘুলির সামনে দাঁড়াল।

গম্ভীর মুখে সত্য হালদার তার দিকে তাকালেন শুধু। বসতেও বললেন না।

—অরু আসে নি ?

—সে তার সময় মতোই এসে চলে গেছে, তুমি সাড়ে সাতটার জায়গায় সাড়ে আটটায় এসেছ।

বিব্রত মুখে বরুণ চক্রবর্তী বলল, না তো···সাড়ে আটটাতেই ওর আসার কথা এখানে···

ভিতরটা বিরূপ হয়েই ছিল সত্য হালদারের। নীরস স্বরে বলে উঠলেন, সাড়ে আটটায় আসার কথা ছিল আর সাড়ে সাতটায় ও এসে তোমাকে না পেয়ে টাকা রেখে গেল ?

থতমত খেয়ে বরুণ চক্রবর্তী বলল, ও···

ড্রয়ার থেকে টাকা বার করে সত্য হালদার তার দিকে ঠেলে দিলেন।—গুনে নাও, সাড়ে সাতশ আছে।

টাকাটা গোনার জন্যেই সামনের চেয়ারে বসতে হল তাকে। গোনা শেষ হতেই সত্য হালদার জিজ্ঞাসা করলেন, টাকা ক' দিনের জন্যে ধার নিলে ?

বরুণ চক্রবর্তী জবাব দিল, বিয়ের মাস এটা, লগনশার বাজার—এ-মাস শেষ হলেই দিতে পারব।

ধার-ধার গলায় সত্য হালদার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ওর কাছ থেকে টাকা এই প্রথম নিলে ?

বিব্রত মুখে সে জবাব দিল, হ্যাঁ···বিয়ের বাজারে কিছু টাকা পেলে বড় পার্টি ধরার সুবিধে হত শুনে ও নিজেই টাকাটা নেবার জন্য জোর করল।

বিরক্ত মুখে ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করলেন সত্য হালদার, আশ্চর্য ছেলে···

ঠিক না বুঝে বরুণ চক্রবর্তী টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে

জিজ্ঞাসা করল, কে···অরু ?

ঈষৎ ব্যঙ্গ স্বরে সত্য হালদার পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি কি ভাবছ ?

বরুণ চক্রবর্তী কোন রকম ঘোর প্যাঁচের ধার দিয়েও গেল না। সায় দিয়ে বলল, কেউ কোনো ভাবে ঠেকে গেলে ও এ-ভাবেই এগিয়ে এসে সাহায্য করে—সে রকম দরকার পড়লে ধার করে পর্যন্ত টাকা এনে দেয়।

—লোকে সেটা মনে রাখে ? টাকা ফেরত দেয় ?

—দেয়। আবার এক-এক সময় মারও খায় এই করে। কত সময় বারণ করি, কিন্তু ওর সেজন্যে কোন তাপ-উত্তাপ নেই।

প্রশংসার কথাগুলো শুনে সোমা যেমন খুশি তেমন বিরক্ত। বিরক্ত কারণ, বন্ধুর এ-রকম মন জেনে তার কাছ থেকে সাড়ে সাতশ টাকা নিয়ে পকেটস্থ করতে ছাড়ল না। ও-দিকে তার মনের কথাগুলোই যেন বাবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

সত্য হালদার বললেন, বারণ তো করো, কিন্তু তোমার নিজেরই তো আবার অতগুলো টাকা দরকার হয়ে পড়ল—

বসন্তের দাগ-মারা বোকা-বোকা মুখে এতক্ষণে একটু প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। ঈষৎ গম্ভীর মুখে জবাব দিল, এ টাকা ওর মারা যাবে না, বরং কিছু বেশিই দিতে চেষ্টা করব—

উঠে চলে গেল। একটু রাগ করেই গেল হয়ত। কিন্তু সোমা একটুও অখুশি হল না। এ-সব লোককে এ-ভাবে না বললে কানে জল ঢোকে না।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি সেই রাতেই কৃষ্ণনগর থেকে ফিরেছে এবং এখানে এসেছে। সত্য হালদার তখন বাড়ি নেই। সোমা বাইরের ঘরেই বসিয়েছে তাকে। তবু লজ্জা-লজ্জা করছিল কেমন। যত্ন করে চা বানিয়েছে সঙ্গে কিছু খাবারও সামনে রেখেছে। তারপর সহজ আলোচনার তাগিদে বরুণ চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে।—আপনি যাবার পর এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার বন্ধু এসে টাকা নিয়ে গেছে।

—নেবার কথাই তো। অরবিন্দ গাঙ্গুলির চায়ে মনোযোগ।

—খুব ভালো কথা নয়। তাকে নাকি আপনি সাড়ে আটটায় আসতে বলেছিলেন?

—তা হবে···ঠিক মনে নেই। ও বলল বুঝি? যাকগে, ভালো কথা নয় বললে কেন?

কেন আবার! কেউ ঠেকে পড়লে আপনি নাকি ধার করে এনেও লোককে টাকা দেন?

অরবিন্দ গাঙ্গুলি হেসে উঠল।—পাজীটা এ-সব কথা তোমাদের বলে গেল বুঝি?

—হ্যাঁ, সাড়ে সাতশ টাকা গুনে পকেটে পুরে তারপর এ-সব কথা বলল। তবু বন্ধুর সুখ্যাতি করতে জানে দেখে খুশি হলাম।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি তেমনি হাসতে লাগল। তারপর বলল, সেই ছেলেবেলা থেকেই ও আমার অন্ধ ভক্ত—ভারী ভালবাসে।

সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক মনে হল না সোমার। অন্ধ ভক্ত হওয়ার আর ভালবাসার মতোই মানুষ যে এ কথা কে বলবে।—এভাবে টাকা ধার দিয়ে আপনি তো ঠকেনও অনেক শুনলাম?

অরবিন্দ গাঙ্গুলির জবাবটা হালকা থেকে গভীরতার দিকে গড়ালো এবার। বলল, কেউ বিপাকে পড়েছে শুনলে আমার সত্যিই কেমন গণ্ডগোল হয়ে যায়, তখন মনে হয় নিজেরই ওই বিপদ। এটা একটা রোগের মতো আমার বুঝলে···কেউ কোন-রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে জানলে আমার নিজেরই কাঁপুনি ধরে। হাসতে লাগল।—কলেজে পড়তে এ-জন্যে আমি ডাক্তার পর্যন্ত দেখিয়েছি, জানো—

সোমা অবাক।—ডাক্তার দেখিয়েছেন!

সত্যি দেখিয়েছি। সেই ন'বছর বয়সে আমার মা মারা গেছে, আর বাবা গেছে আমার তেরো বছর বয়সে—তারপর থেকে কত রকমের বিপদের ছবি যে আমার মাথার মধ্যে গজাতো তুমি ভাবতে পারবে না—ভয়ে ত্রাসে পাগলা হয়ে যেতাম আমি। তখন কি কাণ্ড করতাম আর কত পাগলের মতো কথা বলে নিজেকে ভোলাতাম জানো না। দাদারা আবার ভয়ানক গার্জেনগিরি ফলাতো আমার ওপর। বাবা

মা নেই বলে সর্বদা শাসন করত—সেজন্য তাদেরও কোন সময় নিজের লোক ভাবতে পারতাম না। তখন সর্বদা আমার মনে হত পায়ের নিচে মাটি নেই—আমি যেন একটা অনিশ্চয়তার ফাঁস গলায় এঁটে ঝুলছি। সেই জন্যই এখনো কোনরকম অনিশ্চয়তার ত্রাস আমি বরদাস্ত করতে পারি না—কে ঠকাবে আর কে ঠকাবে না তারও পরোয়া করি না।

এত হাসিখুশি মানুষটার মুখে এরকম কথা আর কখনো শোনেনি, হাঁ করে সোমা এই মুখখানাই দেখছিল আর দরদে ভিতরটা ভরে যাচ্ছিল।

একটা দুটো করে দিন যায়, আর সোমা কেন যেন বরুণ চক্রবর্তীর ওপরেই রাগে জ্বলতে থাকে। বসন্তের দাগমারা মুখটা উত্তরোত্তর কুৎসিত মনে হয় তার। এই বীতরাগের কারণ সহজ অনুমান সাপেক্ষ। অরবিন্দ গাঙ্গুলি ওকে কত পছন্দ করে সোমা সেটা নিজের মন দিয়ে অনুভব করতে পারে। মানুষটার দু'চোখের তারায় সেটা যেন স্পষ্ট লেখা। কিন্তু বন্ধুর মুখ চেয়েই সে হয়তো মুখ ফুটে সে-কথা বলে না, বলতে পারে না। সোমার বিশ্বাস, লোকটার এখনো মনে মনে ধারণা ওই বরুণ চক্রবর্তীই এ বাড়ির ছোট জামাই হবে। কিন্তু সেটা যে অসম্ভব রকমের ভুল এ আভাস সোমা তাকে বেহায়ার মতো জানায় কি করে? এ-রকম কোনো প্রসঙ্গ উঠলে সেটা সে সাফ বলে দিতে পারে। বলতে পারে আজন্ম বিয়ে না হলেও সোমা হালদার ওই বরুণ চক্রবর্তীর ঘরে যাবে না—এটা আপনার বন্ধুকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবেন। কিন্তু বলার মতো সুযোগ আসে না। ফলে রাগটা গিয়ে পড়ে বরুণ চক্রবর্তীর ওপর।

কিন্তু একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেল সেদিন। পিছনের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখল, বাবা লোকটার ছক নিয়ে বসেছে। ওই অরবিন্দ গাঙ্গুলির। সে-ও সামনে বসে। বাবা ছক দেখছে আর এটা-সেটা বলছে। যেমন, ছেলেবেলায় তোমার বাপ-মা মারা গেছেন···দাদাদের শাসনে ছিলে, তাদের সঙ্গে তোমার বনে না···তখন নানারকম দুশ্চিন্তায় ভুগতে তুমি···

এদিক দিয়ে বাবার কাণ্ড দেখে সোমা ভ্রূকুটি করেছে। কথায় কথায় লোকটার এ-সব গল্প সে-ই বাবার কাছে করেছে।

লোকটা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছে আর মাথা নাড়ছে।

ঠিকুজি নেড়েচেড়ে বাবা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কথা একটু বেশি বলো বুঝি?

অম্লানবদনে সায় দিল, বলল, এই দুশ্চিন্তার রোগ থেকেই এই রোগ—হরদম দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানাচ্ছি।

সোমা এদিক থেকে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসেছে।

সত্য হালদার ঠিকুজিতে মনোনিবেশ করেছেন আবার।—এমনিতে ভালোই, কিন্তু অনেক রকমের ঝামেলা আছে তোমার। রাহুটা সব থেকে বেশি উৎপাত করবে, একটা আট রতির গোমেদ ধারণ করা উচিত। আর মঙ্গলটাও খুব ভালো নয়, একসময় বড় রকমের অ্যাকসিডেন্ট ফ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

কিন্তু এ-সব জানার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ নেই যেন লোকটার। বলল, গোমেদ একটা না হয় আপনিই সিলেক্ট করে দেবেন, আর কি ভবিষ্যত দেখছেন বলুন।

সত্য হালদার নিবিষ্টচিত্ত।—বয়েস তো তোমার তিরিশ দেখছি এখন···।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বিয়ের সময় হয়েছে। ভালো বিয়ে হবে।

ঘুলঘুলির ওধারে সোমা নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল, ঠিকুজি দেখে এও বলা যায় নাকি আবার!

—যায় বই কি, সব বলা যায়।

ঠোঁটকাটা আর কাকে বলে, জিজ্ঞাসা করে বসল, বউ লেখাপড়া জানা হবে?

—গ্র্যাজুয়েট তো নিশ্চয় হবে।

ও-দিকে দাঁড়িয়ে সোমা ধড়ফড় করছে।

মানুষটার লজ্জা-সরম নেই।—আর দেখতে শুনতে?

বাবা রয়ে-সয়ে জবাব দিল, দেখতে বেশ সুশ্রীই বলতে পার।···নাক মুখ চোখ ভালো, গায়ের রং একটু চাপা···বেশ দীর্ঘাঙ্গী···আর একপিঠ চুল মাথায়···না, তোমার স্ত্রীভাগ্য বেশ ভালো দেখছি।

মুখ লাল সোমার। হেসে ফেলারও দাখিল সেই সঙ্গে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেয়ানা বটে বাবা। ফাঁক পেয়ে নিজের মেয়ের চেহারাটাই সামনে তুলে ধরল। তার চুলের গোছা ওই লোকটা দেখেছে কিনা সোমা মনে করতে পারল না।

এ-ব্যাপারের সাত দিনের মধ্যে সরস্বতী পুজোর সকালে সেই বিভ্রাট।···ভোরে স্নান সেরে পিছনের দরজা ভেজিয়ে সোমা আদুড় গায়ে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে আয়নার সামনে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। চুলগুলো চিরুনির বশে আনার চেষ্টায় বুকের একদিকের কাপড় সরে সরে যাচ্ছিল—তন্ময় হয়ে নিজেকেই একটু দেখে নিচ্ছিল সোমা। ফুলের ঝুপড়ি হাতে ওই লোকটা কখন দরজা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল জানে না।

···আর তারপর খেতে বসে সেই কাণ্ড। খাওয়ার রুচি নেই, আত্মহত্যা বিধিলিপি নাকি।

দিদিরা চলে যেতে বিকেলে এক ফাঁকে ঠিক এসে ধরেছে ওকে। বাবা দিদিদের এগিয়ে দিতে গেছে সেই ফাঁকে বরুণ চক্রবর্তী ঘরে এসে ঢুকেছে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছে, তোমার বাবা ভরসা দিয়েছেন, আত্মহত্যা করতে হবে না।

বিয়ে হয়ে গেছে।

বরুণ চক্রবর্তী সেই বিয়েতে মাছ সাপ্লাই করেছে। পেট ভরে নেমন্তন্নও খেয়েছে। তার ওপর সোমার সব রাগ রাতারাতি জল হয়ে গেছে। তার মাথায় অনেক দায়িত্ব চাপিয়েছে অরবিন্দ গাঙ্গুলি। সবার আগে ছোটাছুটি করে তাকেই একটা বাসা ভাড়া করতে হয়েছে। নিজে একখানা খুপরি ঘর ভাড়া নিয়ে আছে, রাত বারোটায় ক্যানিং

এর বাজারে মাছ ডাকার জন্য ছুটতে হয় আর সকালের আগে ফেরে না—তাই দিনের কয়েক ঘণ্টা ছাড়া সে-ঘরও বেশির ভাগ সময় তালা বন্ধ থাকে। ক্যানিং এও তার ছোট্ট ডেরা আছে একটা, রাতের কয়েক ঘণ্টা সেখানেই ঘুমিয়ে নেয়।

বাড়ি ভাড়ার দরকার হয়েছে বউভাতের জন্য। কারণ, অরবিন্দ রাতে থাকে পাড়ার একটি ক্লাব ঘরে। প্রাণের বন্ধু দীপেন ভটচায। সেই ক্লাবের মাতব্বর। বীণার খুড়তুতো ভাই দীপেন ভটচায। অরবিন্দ তার সঙ্গে কলেজে বছর দুই পড়েছিল। তার মরুব্বিয়ানায় বিনা ভাড়ায় সেই থাকার জায়গা মিলেছে। কিন্তু সেখানেই বা বউ নিয়ে গিয়ে ওঠে কি করে, আর ওই এক ঘরে বউভাতই বা হয় কি করে।

সত্য হালদারের ইচ্ছেটা অন্য রকম ছিল। বিয়ের দিনক্ষণ পাকা-পাকি করে ফেলার পর অরবিন্দর দাদাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছে ছিল। শুনেছেন শিয়ালখেদায় মস্ত দালানকোঠা এদের। দাদাদের সঙ্গে সদ্ভাব থাক আর না থাক এক-তৃতীয়াংশের মালিক তো বটেই ছোট জামাই। বিয়ের সময়ও সমস্ত সম্পর্ক ছেটে বসে থাকা বিষয়-বুদ্ধির লক্ষণ নয়। অতএব তিনি চেয়েছিলেন দাদাদের খবর দিয়ে বউভাতের অনুষ্ঠানটা সেখানেই হোক।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি সে-প্রস্তাব কানেও তোলেনি। বলেছে, খবর পেলে দাদারা বরং বিয়ে বন্ধ করতে চেষ্টা করবে, তাদের চেনেন না।

সত্য হালদার ঘাবড়েছেন আর চুপ মেরেও গেছেন।

না ছোট মেয়ের বিয়েতে খরচের কার্পণ্য করেননি তিনি। চার জামাইয়ের মধ্যে ছোট জামাইয়ের ওপরেই তার সব থেকে বেশি নির্ভর। কারণ সে চেষ্টা করলে শ্বশুরের অবস্থা ফেরাতে পারে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল। দ্বিতীয়, বরাত জোরে যে জামাই জুটেছে তাতে মেয়েটাকেও ছেড়ে থাকতে হবে না বা তিনি নিরাশ্রয় হবেন না এই বয়সে। এটাই যখন কর্মস্থল, মেয়ে-জামাই এ-বাড়িতে তাঁর সঙ্গেই থাকবে এও স্থির। অতএব তাঁর দেখাশুনার লোকের অভাব হবে না। মনের আনন্দে তিনি বাড়ির লাগোয়া বাড়তি জমিটুকু বিক্রী করে দিয়েছেন। তারপর

এই দুর্মূল্যের বাজারেও অন্য মেয়েদের থেকে কম ঘটা করেননি।

মায়ের দেওয়া ছোট মেয়ের ভাগের সোনা তৃতীয় মেয়ের বিয়েতে খরচ করে ফেলেছিলেন। ঢের বেশি দাম দিয়ে যা খরচ করেছেন তার অনেক বেশিই কিনেছেন তিনি। মেয়ের পছন্দমত গয়না গড়িয়ে দিয়েছেন। দু'ছড়া হার আট গাছা চুড়ি বালা চুড় কানের দু'সেট দুল দুটো আংটি, জামাইয়ের সোনার বোতাম খাট ড্রেসিং টেবিল—বলতে গেলে কিছুই বাকি রাখেননি। নেমন্তন্নের ঘটা কমিয়েও কম করে বাইশ হাজার টাকা তাঁর খরচ হয়েছে। হোক। এই শেষ কাজ, ভালো করেই চুকেবুকে যাক।

বউভাতসুদ্ধ ধরে সোমা মাত্র দিন পনেরোর জন্য সেই ভাড়াটে বাড়িতে ছিল। তারপর বাপের তাগিদে অরবিন্দকে নিয়ে এ বাড়িতে উঠে এসেছে। আসতেই যখন হবে বাড়তি ভাড়া গুনে কি লাভ। মাঝখান থেকে বিয়ের জিনিসপত্রগুলো সেখানে ধুলো পড়ে নষ্ট হচ্ছে।

হ্যাঁ তিনটে মাস সব-কিছু ভুলে থাকার মতোই আনন্দে কেটেছে সোমার। মাত্র তিনটে মাস। এ লোককে সামাল দিতে গিয়ে নাজেহাল সে। অফুরন্ত হাসি আর অনর্গল কথার তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ওকে। আর সেই ফাঁকে নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

সোমার প্রথম শর্ত ছিল এখন ছেলেপুলে নয়। ঝাড়া হাত পায়ে কিছুদিন আনন্দে কাটুক। এই লোক যখন নিজের কাজে পাঁচ জায়গায় যাবে তখন ও-ও সঙ্গে যাবে, ঘুরবে বেড়াবে। সবেতে এক কথায় রাজি অরবিন্দ গাঙ্গুলি। কিন্তু রাতে—রাতে কেন, দিনে দুপুরেও প্রত্যাশার মুহূর্তে বেপরোয়া হামলা মানুষটার। শর্তের কথা শোনালে দু'কথায় নস্যাৎ করে দেয়, বলে। সব ঠিক আছে, আমি কি কাঁচা ছেলে নাকি, তোমার কোনো ভাবনা নেই।

খুব যে একটা ভাবনা সোমার ছিল তাও নয়। সেই দুরন্ত তৃষ্ণার আবেগে সে নিজেও ভেসে যেত। গোড়া থেকেই স্নেহ ভালোবাসাবঞ্চিত এই মানুষটার ওপর ভারী মায়া পড়ে গেছল তার। দু'হাতে তাকে

আগলে রেখে সেই স্নেহ ভালোবাসার অভাবটা পূরণ করে দিতে চেয়েছে। ফলে দু'মাস না গড়াতে সচকিত। শরীরটা হঠাৎ কেমন বেতালা লেগেছে সোমার। আর কিছুদিনের মধ্যেই যা বোঝবার বুঝে নিয়েছে। আগন্তুক আসছে। তখন অবশ্য রাগও হয়েছে।

—তুমি না বলেছিলে ভাবনার কিছু নেই, এখন কি হল ?

শোনার পর খুশিতে আটখানা হয়ে আরো ডবল আদর করতে চেয়েছে। বলেছে ভাবনার আবার কি, আমি কি-রকম পুরুষ মানুষ একবার অন্তত যাচাই হয়ে যাওয়া দরকার।

রাগ সাময়িক। ভিতরে ভিতরে শেষে খুশিই হয়েছে সোমা। রাতে আনন্দের জোয়ারে ভেসে কত দিন ওই বুকে মুখ ঘসতে ঘসতে জিজ্ঞাসা করেছে, কি হবে বলো, ছেলে না মেয়ে ?

অরবিন্দ গাঙ্গুলি নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেছে, মেয়ে।

—কক্ষনো না। ছেলে।

—উঁহু, তোমার মতো মেয়ে।

—কক্ষনো না। তোমার মতো ছেলে।

দুজনের হুটোপুটিতে সব ঘোষণাই বিস্মৃতির অতলে ডুবেছে তারপর।

আর এক ব্যাপারেও মানুষটা অবুঝের মতো নাজেহাল করেছে তাকে। ফটো তোলার ব্যাপারে। জোরজার করে গায়ের জামা কেড়ে নিয়ে আয়নার সামনে চিরুনি হাতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পিছন থেকে কি বিচ্ছিরি যে ছবি তুলেছে ফটাফট—পরে সেই সব ছবি দেখে সোমার দু'কানের ডগা পর্যন্ত লাল। কেড়েকুড়ে নিয়ে কতগুলো ছবি নষ্ট করেছে কিন্তু সবগুলো পারেনি। এমন দাঁড়িয়ে থাকত যে, স্নান সেরে তার উপস্থিতিতে ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়ানো দায় হতো। আবার এক-একদিন হেসে হেসে বলত, সেই সরস্বতী পুজোর সকালে তোমাকে ওভাবে মাথা আঁচড়াতে না দেখলে আমি অতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতাম না আর তুমি তাহলে ঠিক ওই বরুণ চক্রবর্তীর গলায় গিয়ে ঝুলতে।

অন্য সময় নিজেই আবার নিজের কথা নাকচ করেছে। বলেছে,

বরুণের সঙ্গে তোমাদের এখানে প্রথম ঢোকার তিন মাস আগে থেকে তোমাকে লক্ষ্য করেছি, একটু দেখার জন্য রাস্তার এক-একটা ওষুধের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছি। আর তখন থেকেই তোমাকে পাওয়ার পাঁয়তারা কষেছি। বলেছে আর নিজের বাহাদুরীতে হা-হা করে হেসেছে।

লোকটা কথা একটু বেশি বলে। আর সব কথার মধ্যে নিজেকেই বেশি জাহির করে। কিন্তু তাও খারাপ লাগত না সোমার। মনে মুখে আগল নেই—ভালোই।

বরুণ চক্রবর্তী ওদের বিয়ের পর এ-বাড়ি আসা কমিয়ে দিয়েছিল। বলত ব্যবসার ধকল বাড়ছে, সময় পাচ্ছে না। তার মুখ দেখে মনের কথা বোঝা যেত না। আগের মতোই নিরীহ হাবভাব। সোমা অরবিন্দকে বলেছে, তোমাদের ওই বীণা ভটচাযের সঙ্গেই বরুণবাবুর বিয়েটা লাগিয়ে দাও না—

অরবিন্দ গাঙ্গুলির এ-সব কথায় ভারী উৎসাহ। বন্ধুর কানে প্রস্তাবটা তুলেছে। সে রাজি হলে দীপেনকে বলবে। কিন্তু তার আগেই হতাশ হয়ে সোমাকে জানিয়েছে বরুণটা একটা অপদার্থ, তার নাকি বিয়ে করার মতো অবস্থা এখনো হয়নি। আসলে একবার ঘা খেয়ে আবার বাতিল হবার ভয়েই এইরকম বলে—বুঝলে?

সোমা না বোঝার ভান করতে ছাড়ে না।—একবার আবার কে বাতিল করল?

দু'হাতে তাকে কাছে টেনে নিয়ে অরবিন্দ ভালো করেই বুঝিয়ে দেয় কে বাতিল করল। নিজেই নিজের তারিফ করে উঠল তারপর আরে বাবা আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে দশঘাটের জল খেয়ে আসতে হবে তোকে—তা বলে সেই শোকে বিয়েই করবি না?···বীণাটাও নাক উঁচু মেয়ে অবশ্য, মাছের ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে শুনলে আঁশবটি নিয়ে তাড়া করবে হয়তো—কিন্তু এ শর্মা চেষ্টা করলে না পারে কি?

ঘুরে-ফিরে সেই নিজের কেরামতির কথা। হাসি চেপে সোমা ভুরু কোঁচকালো।—তুমি নিজের মুখে নিজের কথা এত বেশি বলো কেন?

এ-রকম বললে তবে লোকটা তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনে।

দীপেন ভটচায প্রায়ই আসে আড্ডা দিতে। কিন্তু ওই লোকটার হাবভাব চাঁছা-ছোলা আবার। একেবারে উল্টো। কি করে যে এত বন্ধুত্ব দুজনের ভেবে পায় না। অরবিন্দ গাঙ্গুলি বেশি কথা বলা শুরু করলে ধমকে থামায়। বলে, বাজে বকিস না, থাম এবার! সোমাকেও একদিন বলল, তুমি ওর এই বেশি কথা বলার অভ্যাসটা বন্ধ করো দেখি ম্যাডাম—

ভালো মুখ করে অরবিন্দ গাঙ্গুলি জবাব দিল, বন্ধ করবে কি করে? তাহলে তো সারাক্ষণই ওকে আমার মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকতে হয়!

সোমাকে ঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছিল।

মাস তিনেকের মধ্যে সামান্য একটা ঘটনা থেকে সোমার মনে একটা সংশয়ের আঁচড় পড়েছিল। তার আগেও অর্থাৎ বিয়ের প্রথম আবেগ আর প্রথম উচ্ছ্বাস একটু স্থির হতে মানুষটার কিছু আচরণ খুব স্বাভাবিক মনে হয়নি সোমার। যেমন বিয়ের দশ-পনেরো দিন বাদেও লোকটা কাজে বেরোয় না দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপিস-টাপিস করছ না যে, কি ব্যাপার?

জবাব দিয়েছে, আপিসের নাম শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে, খবরদার আপিসের নাম করবে না। পরে বলেছেন, আপিস থেকে তো ছুটি ফুরোবার আগে জয়েন করার জন্য জুলুম করছেই···গাঙ্গুলি না হলে কোম্পানী অচল এ-রকম ভাব সকলের—কিন্তু এ শর্মা এবার ছুটি ফুরোবার একদিন আগে জয়েন করছে না!

সোমা জিজ্ঞাসা করেছে, কত দিনের ছুটি?

—এক মাস।

সোমা হেসে উঠেছে, বিয়ের নামে একেবারে এক মাসের ছুটি!

—তা না তো কি, আমার বিয়ে চাট্টিখানি ব্যাপার! ছুটি চাইতে আপিসের জাঁদরেল কর্তারা দরাজ হাতে ছুটি দিয়ে কতরকম ঠাট্টা-তামাসা করেছে।

সোমার হঠাৎ মনে পড়েছে কি।···না আপিসের জাঁদরেল লোক ছেড়ে বরের তরফের কোনো গণ্যমান্য লোককে সে উপস্থিত দেখেনি, সেদিক থেকে কোনো উপহারও আসেনি। জিজ্ঞাসা করেছে, বিয়েতে তোমার বাড়ির লোককে তো খবর দাওনি জানি, কোম্পানীরও কাউকে বলোনি নাকি ?

—ক্ষেপেছ ? কোম্পানীর সমস্ত ওপরঅলাদের সঙ্গে একটা কোল্ড ওয়ার চলছে আমার। দাবীপত্র মেনে না নিলে চাকরি রিজাইন করার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছি। ওদেরও অসুবিধে কিছু আছে অবশ্য, আমাকে দিতে গেলে আরো একশজন ফোঁস করে উঠবে। এর মধ্যে নেমন্তন্ন করলে কর্তারা সব দল বেঁধে আসত। তোমাকে দুই-এক হাজার টাকার কিছু উপহার দিয়েই আমাকে কেনার চেষ্টা করত—এই যে এক মাসের ছুটি নিয়ে ঘরে বসে আছি তাতেই চোখে অন্ধকার দেখছেন বাছাধনরা।

মাস ফুরোতে তাকে আবার মোটা ব্যাগ হাতে কাজে বেরুতে দেখেছে অবশ্য। কিন্তু সেটা এত অনিয়মিত যে সোমার অবাক লেগেছে। অরবিন্দ বলে, ফিল্ড ওয়ার্ক করি, আমার কি দশটা-পাঁচটা ধরা-বাঁধা আপিস নাকি ! কখনো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপিস, কখনো সমস্ত দিন রাতই ছুটি—বুঝলে ?

সোমার সঙ্গে তার কথা হয়েছিল মাসে দুশ টাকা করে সে বাবার হাতে দেবে। অরবিন্দ আপত্তি করেছিল, মাত্র দুশ টাকা ! ওতে কি হবে ? অন্তত সাড়ে তিনশ দেওয়া উচিত।

নতুন সুগৃহিণীর মতোই সোমা পরামর্শ দিয়েছিল, দুশ টাকা হাতে পেলেই বাবা খুশি হবে, তাছাড়াও খরচ তো এটা-সেটা যেমন করছ—করবেই। নিজেদের হাতেও কিছু থাকা উচিত।

প্রথম মাসের দুশ টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মাসের দশ বারোদিন কেটে যায় দেখে সোমাই জিজ্ঞাসা করেছে, এ মাসের মাইনে পাওনি এখনো ?

অরবিন্দ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন বলো তো ?

—বাবাকে মাসের টাকাটা দিলে না ?

—দেখেছ ! একদম ভুলে গেছি, আজই এনে দেব ।

দিয়েছে । সোমা জিজ্ঞাসা করেছে, মাইনের টাকা কি ব্যাঙ্কে রেখে এসেছিলে নাকি ?

অরবিন্দ হেসে জবাব দিয়েছে, আমার পকেটই আমার ব্যাঙ্ক, মাইনের কে পরোয়া করে !

তৃতীয় মাসেও সেই একই অবস্থা । এবারে দু-তিনদিন মনে করিয়ে দেবার পর বাবার টাকা হাতে পেয়েছে । মাসের শেষে মাইনে কেন চোখে দেখে না সোমা ভেবে পায় না । বিয়ের আগে শুনেছিলাম ন'শ টাকা মাইনে পায় । কিন্তু সে-টাকা ঘরে এলে পকেটে থাকার কথা নয়, রাখার জন্য ওর কাছেই দেবার কথা ।

এর পরের মাসেই এক ঘটনা থেকে সোমার মনে অস্বস্তির আঁচড় পড়ল একটা । মাঝরাতে একটা হৈ-হৈ কাণ্ড পাড়ায়, কিন্তু সোমা আর অরবিন্দ তাদের ঘরে ঘুমুচ্ছে । অনেকে চেষ্টা করেও সেই ঘুম সহজে ভাঙাতে পারছে না কেউ ।

ঘুম ভাঙ্গার পরেও বাড়িতে এত লোক কেন চট করে বুঝে উঠতে পারছে না । মাথাটা যেমন ভার হয়ে আছে তেমনি ঝিমঝিম করছে সোমার । কিন্তু এরপর ব্যাপারটা যখন বোঝা গেল তখন হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ।

রাতে দরজা ভেঙে চোর ঢুকেছে ঘরে । খাটের তলা থেকে ট্রাঙ্কও টেনে বার করেছিল । তারা টের পায়নি কারণ জানালা দিয়ে ঘরে ওষুধ ছড়িয়ে ওদের ঘুম পাড়ানো হয়েছিল । কিন্তু সামনের বাড়ির একজন দৈবাৎ সেই সময় উঠে বাইরে বেরুতে গিয়ে অন্ধকারে একটা লোককে দেখে আর ঘরের ভিতরে টর্চের আলো দেখে চেঁচিয়ে ওঠে । সত্য হালদারের ঘুম ভেঙে যায়, তিনিও সাড়া দিয়ে দরজা খোলেন । তাদের চোখের ওপর দিয়েই বাইরে থেকে একজন আর সোমার ঘরের ভিতর থেকে দুজন দুড়দাড় পালিয়ে যায় ।

না, সোমার ট্রাঙ্ক অক্ষতই আছে । ভাঙার অবকাশ মেলেনি ।

কি সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল ভেবে সোমা থরথর করে কেঁপেছে। বিয়ের সমস্ত গয়না ওই ট্রাঙ্কে। সে-সব তো যেতই, গায়েরও কিছু থাকত না। ওই ঘুমন্ত অবস্থাতেই খুলে নিয়ে যেত।

পরদিনই সোমা বলল, এ-সব গয়না সে আর একদিনের জন্যেও ঘরে রাখবে না—ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসতে হবে। বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে ব্যাঙ্ক—তাদের লকার আছে সোমা জানে। সেখানে লকার ভাড়া করা যেতে পারে, নয়তো যে ব্যাঙ্কে অরবিন্দর অ্যাকাউণ্ট আছে সেখানেও লকার ভাড়া করা যেতে পারে—

অরবিন্দ ফস্ করে বলে ফেলেছিল, আমার কোনো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট-ফ্যাকাউণ্ট নেই—কাছের ব্যাঙ্কেই রাখা ভালো।

সোমা অবাক একটু।—কোনো ব্যাঙ্কেই অ্যাকাউণ্ট নেই তোমার?

—অ্যাকাউণ্ট নেই অ্যাকাউণ্ট হতে কতক্ষণ, দশ-বিশ-পঞ্চাশ টাকা হলেই অ্যাকাউণ্ট খোলা যায়। যাক, আজই রাখার ব্যবস্থা হয় কিনা দেখো। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আমাকে চেনে, পেয়ে যাব।

সেই দিনই সকাল দশটায় দুজনে মিলে ব্যাঙ্কে গেছে। ম্যানেজার জানিয়েছে দুই-একটা মাত্র লকার খালি আছে, নিলে আজ-কালের মধ্যেই নিতে হবে। চুরি যত বাড়ছে লকারের ডিম্যাণ্ডও ততো বাড়ছে।

সোমা জানালো ও সেই দিনই নেবে।

চেক কাটার সুবিধে পেতে হলে কমপক্ষে দেড়শ টাকা জমা দিয়ে অ্যাকাউণ্ট খুলতে পরামর্শ দিল ম্যানেজার। ওই থেকে লকার ভাড়া আর কনট্রাকট-এর মাশুল কাটান দিয়েও একশ টাকার ওপর ব্যালান্স থাকবে তাহলে।

সোমা তাতেই রাজি। কিন্তু দেখা গেল ওই কটা টাকাও অরবিন্দ সঙ্গে আনেনি। ম্যানেজারকে বলল, দুটো পর্যন্ত ব্যাঙ্কিং আওয়ার্স, তার মধ্যেই টাকা জমা দিয়ে অ্যাকাউণ্ট খুলে যাবে, আর লকারে জিনিসপত্র যা রাখার তাও সঙ্গে নিয়ে আসবে।

বাইরে বেরিয়েই সোমা বিরক্ত, অ্যাকাউণ্ট খুলে লকার নিতে

এসেছ অথচ টাকা সঙ্গে আনোনি ?

অরবিন্দ জবাব দিল, লকার খালি আছে কি না খবর নিতে এসেছিলাম, এক্ষুনি হয়ে যাবে আমি কি জানি ! তুটোর মধ্যে করলেই তো হল।

কিন্তু বাড়ি এসেই আপিসের কি জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল তার। নাওয়া-খাওয়ার পরও সময় নেই আর। পেট মোটা ব্যাগটা তুলে নিয়ে তক্ষুনি রওনা দিল। ওষুধের স্যাম্পল বোঝাই থাকে ওটা—আর ওষুধের লিটারেচর। বলে গেল, তুমি তৈরি থেকো, আমি যাব আর আসব—

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার বদলে বরুণ চক্রবর্তী এসে হাজির। ইদানীং কমই আসে। সোমার ধারণা তার মন-মেজাজ ভাল না। ঘরের লোকের মুখে শুনেছে দীপেন ভট্টাচার্য নাকি তাঁর খুড়তুতো বোন বীণাকে এই লোকের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল। তা সেই মেয়েও নাকি এ প্রস্তাব শুনে নাক সিঁটকেছে। অরবিন্দ গাঙ্গুলি অবশ্য সেই চিরাচরিত বাহাত্বরির মেজাজে সোমাকে বলেছে, সে-চেষ্টা করলে এমন লটবট বাবিয়ে দিতে পারে যে সুড়সুড় করে ওই মেয়ে বরুণ চক্রবর্তীর ঘরে গিয়ে ঢুকবে। কিন্তু বরুণটাই এখনো মন ঠিক করতে পারেনি। পরে ঠাট্টা করেছে প্রথম আঘাতের শোকটাই এখনো ভুলতে পারেনি বোধহয়—

অর্থাৎ সেই আঘাতের শোকের কারণ—সোমা। ও মুখে রাগ দেখায় বটে কিন্তু মনে মনে তারও সেইরকম ধারণা। ফলে এই লোকের জন্য এখন ওর কিরকম যেন মায়াই হয়।

বরুণ চক্রবর্তী এলে এখন আর বাইরের ঘরে অপেক্ষা করে না। ওদের বিয়ের পরে এটুকু পথ অরবিন্দই প্রশস্ত করে দিয়েছে। এসেই জিজ্ঞাসা করল, অরু কোথায় ?

সোমা জবাব দিল, আপিসে। শিগগীরই ফিরবে···আপনি কোত্থেকে ?

—আমি একটু বেরিয়েছিলাম, নিচের তলার লোকের মুখে

শুনলাম অরু খোঁজ করতে এসেছিল, খুব দরকার জানিয়ে আবার ঘণ্টাখানেক বাদে আসবে বলে গেছে। তাই খবর নিতে এলাম।

শুনে সোমা বিমূঢ় খানিকক্ষণ।

—আপনার খোঁজে কখন গেছল ?

—এই আধঘণ্টাটাক আগে।

সোমার ষষ্ঠ চেতনা আপনা থেকেই কেমন একটা ধাক্কা খেল যেন। মাসের আজ ছ'তারিখ। কিন্তু বাবার বরাদ্দ দু'শ টাকা এখনো দেয়নি। খালি পকেটে ব্যাঙ্কে গেছে। এসেই আপিসের তাগিদে ছুটেছে, কিন্তু আগে গেছে এই লোকের বাড়ি। আপিসে গিয়ে থাকলে আবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসেই বাড়ি যাবে কি করে—যাবে কেন ? ওর মন বলল, টাকার তাগিদে গেছল আর আবারও টাকার তাগিদেই যাবে। তক্ষুনি মনে পড়ল, ওদের বিয়ের মাসখানেক আগে ব্যবসার জন্য বরুণ চক্রবর্তী সাড়ে সাতশ টাকা ধার নিয়েছিল। চার মাসের মধ্যেও সে-টাকা ফেরত দেয়নি নিশ্চয়, তা না হলে এর কাছে টাকা চাইতে যাবে কেন !

সোমা ভিতরে ভিতরে তক্ষুনি বিরূপ হয়ে উঠল একটু। এই বরুণ চক্রবর্তীই গল্প করেছিল লোকেরা টাকা ধার নিয়ে অনেক সময়ই ফেরত দেয় না। আর বাবা তারপর সাড়ে সাতশ টাকা নেবার জন্য একটু খোঁচা দিয়ে কি বলতে জবাব দিয়েছিল, এ টাকা মার যাবে না, বরং কিছু বেশিই দিতে চেষ্টা করবে।

কিছু বলা সম্ভব নয়, বলতও না। কিন্তু বরুণ চক্রবর্তীর এর পরের বেফাঁস উক্তিটা ঠাস করে যেন মগজে গিয়ে লাগল সোমার। সে জিজ্ঞাসা করল, আপিসে গেছে মানে সেই পুরনো আপিসে ?

সোমা বলল, আপিস আবার নতুন পুরনো কি, আপিস তো একটাই—

বরুণ চক্রবর্তী হকচকিয়ে গিয়ে বলল, আমি তাহলে ভুল শুনেছিলাম···

কি—ভুল শুনেছিলেন ? ভিতরটা নিজের অগোচরেই সন্দিগ্ধ

হয়ে উঠেছে সোমার।

বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল বরুণ চক্রবর্তী। এই মেয়ের চোখ-মুখ হঠাৎ এ-রকম ধার-ধার কেন বুঝতে পারছে না। ঠেকে-ঠেকে জবাব দিল, অরু নিজের মুখে কিছু বলেনি, দীপেন ভট্চায বলছিল ওর আপিসে অনেক আগেই নাকি কি-সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে, আমাকে বলছিল ওষুধের এই ব্যবসা-ট্যাবসাও ওর দ্বারা হবে না—তোমার সঙ্গে মাছের ব্যবসায় লাগিয়ে দাও। হুট্ করে বিয়ে করে বসার জন্যেও রাগ করছিল—

ভিতরটা তেতে উঠতে লাগল সোমার। নিঃসংশয়ে মনে হল, ওকে বিয়ে করতে না পারার জ্বালাতেই আজ বন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভালো মুখ করে এ-সব কথা শোনাচ্ছে। নইলে আপিসের কাজে ঘরের লোক যে আদৌ পরিতুষ্ট নয় সোমা নিজেই সেটা জানে। সেখানে খটাখটি আর মন কষাকষি চলছে এও সোমার অজানা নয়।

অনুচ্চ ঝাঁঝালো সুরেই বলে উঠল, চাকরি না রাখার মতো কিছু ঘটে থাকলে আপনি না জানুন আমার সেটা জানার কথা বোধহয়?

ঘাবড়ে গিয়ে বরুণ চক্রবর্তী সায় দিল, হ্যাঁ তা তো জানার কথাই।

সোমা আবার শ্লেষের সুরে জিজ্ঞাসা করল, আপনার মাছের ব্যবসা এখন কেমন চলছে? খুব ভালো?

—ইয়ে, খুব না, তবে একটু ভালোর দিকেই।

সোমার রাগ বাড়ছে। ব্যবসা ভালোর দিকে কিন্তু সেই সাড়ে সাতশ টাকা হজম করে বসে আছে। হাসতেই চেষ্টা করল।—আপনি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছেন কেন, দীপেন ভটচার্যের কথামতো আপনার ব্যবসায় ডেকে নেবার জন্যে?

—না না, ওর চাকরি-বাকরির ব্যাপারটা আমি ভালো করে জানিই না কিছু। বাড়িতে আমার খোঁজ করতে গেছল, আবার খুব দরকার বলে এসেছে তাই খবর নিতে এলাম।

সোমা তার মুখের ওপর থমকে তাকালো। বসন্তের গুটিকতক দাগমারা সাদাসিধে মুখটা কেন যেন আরো বেশি কুৎসিত লাগল।

যে-কথা কখনো উচ্চারণ করতে পারবে ভাবেনি ঠাণ্ডা মুখে তাই বলে ফেলল।—আপনার বাড়ি কেন গেছল তা আমি জানি, হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে···কাল রাতে আমাদের বাড়িতে সাংঘাতিক চুরির অ্যাটেম্পট হয়ে গেছে, ঘরে ঘুমের ওষুধ ছড়িয়ে আমাদের বেহুঁস করে ফেলা হয়েছিল—

—কি সর্বনাশ! নেয়নি তো কিছু?

—না তার আগেই লোক জানাজানি হয়ে গেছে। চোর পালিয়েছে—

—তারপর? তবু নিঃশ্বাস রুদ্ধ বরুণ চক্রবর্তীর।

—তারপর আর কি! ঘরে যা আছে সব ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসব ঠিক হয়েছে—ব্যাঙ্কে সেই অ্যাকাউন্ট খোলার জন্যই টাকার দরকার—চাকরি করলেও সব সময় তো ঘরে টাকা থাকে না—

—তা তো বটেই, বরুণ চক্রবর্তী মাথা নেড়ে সায় দিল।—কত দরকার?

—আপাতত দেড়শ। বলে ফেলার পর মনে হল আরো বেশি বললে ভালো হত, সাড়ে সাতশ'র মধ্যে যা উশুল হয়। কিন্তু বলে ফেলার পর সেটা আর ফেরানো গেল না।

কিন্তু টাকাটা তক্ষুনি পাবে সোমা আশা করেনি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বরুণ চক্রবর্তী টাকা বার করল কিছু। খান তিনেক একশ টাকার নোট আর কিছু দশ টাকার। তার থেকে দেড়শ টাকা পৃথক করে সোমার দিকে এগিয়ে দিল।—এটা রাখো তাহলে···

হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিতে একটুও দ্বিধা বোধ করল না সোমা। তারপরেও ভিতরের অসহিষ্ণু ভাবটা কমেনি। ও-যে সব জানে সেটা বোঝাবার জন্যেই বলল, তাহলে এলে কি বলব··· সাড়ে সাতশ টাকার মধ্যে আপনি দেড়শ রেখে গেছেন?

বরুণ চক্রবর্তী বিমূঢ় মুখে চেয়ে রইল খানিক। কি বলছে তাই যেন বোধগম্য হচ্ছে না।—সাড়ে সাতশ টাকা কি···?

এ-রকম ভিজে বেড়ালের মুখ দেখলে কার না রাগ হয়। আলতো

ঠাণ্ডা সুরে সোমা বলল, আমার বিয়ের আগে বাবার হাত দিয়ে এর কাছ থেকে যে সাড়ে সাতশ টাকা নিয়েছিলেন, এটা তার থেকে দিচ্ছেন তো ?

লোকটা যেন হতভম্ব খানিক। বসন্তের দাগ-মারা মুখের একটু নীরব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে সোমা।

বরুণ চক্রবর্তী গম্ভীর মুখে বলল, সে-টাকা আমি পরের মাসে তোমার বিয়ের আগেই শোধ করে দিয়েছি—সাড়ে সাতশ'র জায়গায় আটশ দিয়েছি—আর তার পরেও দিয়েছি কিছু···এই দেড়শ আমার নিজেরই টাকা।

গালের ওপর যেন আচমকা একটা চড় খেয়ে উঠল সোমা। বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না। বিশ্বাস করতে চায় না, আবার বিশ্বাস না করার মতো শক্তিও যেন পাচ্ছে না। হাতে-ধরা দেড়শ টাকা আবার তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিক্ত স্বরে বলে উঠল, তাহলে আপনার টাকা আপনি নিয়ে যান. আপনার টাকা আমি নিতে যাব কেন ! নিন, নিন— !

এবারে আবার ঘাবড়েই গেল বরুণ চক্রবর্তী। একটা কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে বুঝতে পারছে। সামাল দিতে চেষ্টা করে বলল, তুমি রাগ করছ কেন বুঝতে পারছি না—টাকা হঠাৎ-হঠাৎ মানুষেরই দরকার হয়—আমার দরকারের সময় আমিও তো নিয়েছি—শুধু আমি কেন, বিপাকে পড়ে কত জনে কত টাকা নিয়েছে অরুর কাছ থেকে তুমি ধারণা করতে পারবে না। টাকাটা রাখো—আমি পরে আবার এক সময় আসব'খন।

ভরসা করে আর অপেক্ষা করতে পারেনি। দ্রুত পালিয়ে এসে বেঁচেছে যেন।

হাতের টাকা তবু ছুঁড়েই ফেলে দিতে ইচ্ছে করছিল সোমার। কিন্তু এর মধ্যেই মনে হল মাথা গরম করলে ভুল হবে। তলিয়ে ভাবার মতোই আছে কিছু। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে টাকাটা তার মধ্যে রাখল। টাকা শোধ না করেও ও-কথা বলে যাবার মতো

বুকের পাটা বরুণ চক্রবর্তীর নেই। তার মানে এই একজনই আজ তার কাছে উল্টে ধার চাইতে গেছল।

...মাসের আজ ছ'তারিখ। সরকারী আপিস নয় যে পয়লা তারিখেই মাইনে হবে—আট-দশ তারিখেও হতে পারে। গত তিন মাসে তাগিদের পরে বাবাকে টাকা এনে অবশ্য দিয়েছে, কিন্তু থোক মাইনে সোমা চোখে দেখেনি আজ পর্যন্ত। কি যে ব্যাপার হতে পারে কিছুই মাথায় আসছে না ওর। দীপেন ভট্টাচার্যের চাঁছাছোলা মুখ, সে কি ইয়ারকি করে বরুণ চক্রবর্তীকে নিজের ব্যবসায় টেনে নিয়ে যেতে বলেছিল বন্ধুকে? ভুরু কুঁচকে ভাবতেই লাগল সোমা।

...হুট করে বিয়ে করে বসার জন্যে দীপেন ভট্চায নাকি রাগও করেছিল। ব্যাটাছেলে তিরিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছে সেটা হুট করে কি করে হল! এই উক্তি বরুণ চক্রবর্তীর নিজস্ব হতে পারে। গায়ের জ্বালায় বলেছে। কিন্তু বরুণ চক্রবর্তীর এ-রকম বানিয়ে বলার মতো সাহস হবে!...দীপেন ভট্টাচার্য ইদানীং কম আসছে। সোমার খেয়াল হল, এলে হৈ-হৈ করে এই লোক আজকাল তাকে ঘরে ডেকে এনে বসায় না। তার সাড়া পেলে নিজে বাইরে চলে যায়।

মাথাটা বিচ্ছিরি ঝিমঝিম করছে সোমার। ঘরের এক কোণে মাঝারি সাইজের হা-করা স্যুটকেস একটা। ওতেই আর একজনের জামা-কাপড়-প্যাণ্ট থাকে। সোমার কতদিন মনে হয়েছে জামাইকে একটা নতুন স্যুটকেস কিনে দেওয়া উচিত ছিল বাবার। হাতে টাকা এলে নিজেই কিনে দেবে ভেবেছিল। হাতে টাকা এলে মানে মাইনের টাকা এলে। যা-ই হোক, ওই খোলা স্যুটকেসে টাকা কেউ রাখতে পারে না। সোমার কাছেও দেয় না, ব্যাঙ্কেও রাখে না। টাকা যা আনে কি হয় তাহলে—পকেটে পকেটেই থাকে? কিন্তু ব্যাঙ্কে গিয়ে তো দেখা গেল তাও নেই। এই অবস্থায় পড়ে কি করে মানুষ তাও মাথায় আসে না! কি অবস্থায় পড়েছে সে-তো বোঝাই যাচ্ছে, নইলে বরুণ চক্রবর্তীর কাছে টাকার জন্য ছুটবে কেন...।

অরবিন্দ ফিরল বেলা তিনটেরও পরে। ঘামে ভেজা মুখ রোদের তাতে কালচে দেখাচ্ছে। ঘরে পা দিয়েই হাসতে চেষ্টা করে তড়বড় করে বলল, আজ আর হল না, ভয়ানক আটকে গেলাম—কাল হবে। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আজ আমি সমস্ত রাত জেগে ট্রাংক পাহারা দেব।

না চান করে না খেয়ে বেরিয়েছে লোকটা। এই মূর্তি দেখে সোমা তক্ষুনি এ-ব্যাপারে একটি কথাও বলল না। নিজেরও খাওয়া হয়নি তখন পর্যন্ত।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে ঢুকেই কথাটা না তুলে পারা গেল না। জিজ্ঞাসা করল, ব্যাঙ্কের কাজ আজ হল না কেন, কোথাও টাকা পেলে না?

অরবিন্দ গাঙ্গুলি ধড়ফড় করে উঠল একটু। বলল, আমি টাকার খোঁজে গেছলাম. তোমাকে কে বলল, আপিসে ভয়ানক দরকারী কাজ ছিল, ভাবলাম সেই সঙ্গে মাইনেটাও যদি নিয়ে আসতে পারি—

মাইনে পেয়েছ?

—নাঃ। সে-জন্যে তুমি কিছু ভেবো না, কালকের মধ্যে ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সোমার এসব কথার মধ্যে ঢুকতে বিচ্ছিরি লাগছিল, তবু মুখের ওপর থেকে দু'চোখ সরাতে পারছে না।—আজ মাসের ছয় তারিখ হয়ে গেল, তোমার মাইনে কত তারিখে হয়?

—আট-দশ-বারো যে-কোনো তারিখ হলেই হল। শালাদের কিছু ঠিক আছে! তারপরেই তড়বড় করে বলে উঠল, এ ঘোড়ার ডিমের চাকরি আমি ছেড়েই দেব—বুঝলে। আজও অবশ্য বড় সাহেব আমাকে ডেকে আদর করে পিঠ চাপড়ালে আর কতরকমের সদুপদেশ দিলে—গাঙ্গুলি ভালো করে কাজ কর, ও-রকম বিগড়ে থেক না। আমি তার মুখের ওপর সাফ বলে দিয়েছি, এভাবে আর আমার পোষাচ্ছে না। কাছে এসে একটু খুনসুটি করে আদর করে নিল সোমাকে, তোমার হঠাৎ এসব ভাবনা কেন—কাল বেলা এগারোটার মধ্যে দেড়শ টাকা হাতে পেলেই তো হল?

এই মুখের দিকে তাকালে সংশয় আপনি কাটে। কিন্তু সোমা চেষ্টা করেও সহজ হতে পারছে না আজ। বলল, দেড়শ টাকা ওই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারেই আছে। বরুণ চক্রবর্তী রেখে গেছে—

—বরুণ! অরবিন্দ এবারে যথার্থ হতচকিত একটু।—তুমি তাকে টাকার কথা বলেছিলে নাকি?

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে সোমা ফিরে জিজ্ঞাসা করল, আপিসে যাবে বলে বেরিয়ে তুমি প্রথমেই তার কাছে টাকার জন্যে গেছলে তো?

—হ্যাঁ···কিন্তু আমার সঙ্গে তো দেখা হয়নি!

—তুমি নিচের তলার লোককে বলে এসেছিলে খুব দরকার—তাই শুনে খবর নিতে এসেছিল। কোন্ দরকারে গেছলে আমিই বলে দিলাম।

লোকটার সমস্ত মুখে খুশী ভরাট হতে দেখল সোমা। স্ত্রীর একটা নতুন গুণ আবিষ্কার হল যেন তার চোখে। মুখেও তারিফ করল, খুব বুদ্ধি তো তোমার! ভালো করেছ, হাতে সত্যিই টাকা ছিল না এখন···

তার মুখের দিকে চেয়ে যে অস্বস্তিটা দূর করতে চায় উল্টে সেটা যেন চেপে বসছে আরো। জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আমাদের বিয়ের আগে ব্যবসার জন্য বরুণ চক্রবর্তী তোমার কাছ থেকে যে সাড়ে সাতশ টাকা ধার নিয়েছিল সে-টাকা ফেরত দিয়েছে?

কিছু না ভেবেই অরবিন্দ জবাব দিল, কবেই তো দিয়েছে—কেন?

—সাড়ে সাতশ'র জায়গায় আটশ দিয়েছে?

—দিয়ে থাকতে পারে, মনে নেই। ঈষৎ উতলা মুখ অরবিন্দ গাঙ্গুলির।

—আর তারপরেও তুমি তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছ?

—দেড়শ টাকা দিতে গিয়ে এসব কথা সে বলে গেছে নাকি? তার বিব্রত মুখে উষ্ণ বিস্ময়ের আভাস।

—বলেনি। ওই সাড়ে সাতশ টাকা এখনো পাওনা আছে ধরে নিয়ে আমি দেড়শ টাকা চেয়েছিলাম। আমার কথা থেকে সেটা বুঝতে পেরে সে উল্টে ওই কথা জানিয়ে আমাকে জব্দ করেছে।···কিন্তু সত্যি

তুমি আজকাল ধার করে বেড়াচ্ছ?

সোমার গলা দিয়ে শেষেরটুকু প্রায় আর্তনাদের মতোই বেরিয়ে এলো।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি প্রথমে থতমত খেল একদফা। তারপর হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, দেখো, আমি দরকার হলে ধার দিই আবার ঠেকে পড়লে ধার করিও। কিন্তু এসব নিয়ে তুমি মোটেই মাথা ঘামিও না সোমা, প্লীজ—

সোমা চুপ মেরে গেছে। কিন্তু মাথা থেকে দুশ্চিন্তা সরাতে পারেনি।

॥ চার ॥

পরদিন একটা থলেতে সমস্ত গয়না পুরে দুজনে ব্যাঙ্কে গেছে। অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। লকারে সব রেখে পাস বই চেক বই আর লকারের চাবি নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

মাসের চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত মুখ বুজেই অপেক্ষা করেছে সোমা। তারপর বলেছে, বাবা মুখ ফুটে চাইতে পারে না, কিন্তু তার অসুবিধে হয়—এখনো মাইনে পাওনি নাকি?

অরবিন্দ বলেছে, এই দু-একদিনের মধ্যেই দিচ্ছি।

বাবার সম্মান রাখার জন্য সোমা বলেছিল, মুখ ফুটে চাইতে পারে না। কিন্তু সত্য হালদার এর মধ্যে বার কয়েক মেয়েকে টাকার কথা বলেছেন। তখন আবার এদিক সামাল দিতে হয়েছে সোমাকে। বলেছে, আপিসে কি-সব গণ্ডগোল চলছে বাবা, মাইনেটা হাতে আসেনি এখনো—পেলেই এনে দেব।

বাবার মেজাজও ইদানীং আবার খুব একটা প্রসন্ন নয়। কারণ বিয়ের দিনকতকের মধ্যেই শ্বশুরের পসারের ব্যাপারে জামাই অনেকখানি নিস্পৃহ। অন্তত আগের মতো উৎসাহ তো নেই-ই। ক্ষুব্ধ হয়ে সত্য হালদার মেয়েকেই সে-কথা শুনিয়েছেন।

সোমা সে-মাসে টাকা হাতে পেল উনিশ তারিখে। অরবিন্দ তার

মোটা ব্যাগ খুলে এক গোছা টাকা তার হাতে দিয়ে বলল, চারশ টাকা আছে, দুশ টাকা বাবার হাতে দাও আর দুশ টাকা তোমার কাছে রাখো।

সোমা অবাক।—ন'শ টাকার মধ্যে মাত্র চারশ টাকা কেন ?

—কিসের ন'শ টাকা ?

—তোমার মাইনে ন'শ টাকা না ?

আধা বিরক্তি স্বরে অরবিন্দ বলে উঠল, মাইনে-মাইনে কোরো না তো, এ শর্মা অত মাইনে-ফাইনের ধার ধারে না—বেরুলেই টাকা—তোমার যখন টাকার দরকার হবে—বলবে। ব্যস।

সোমা চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। মানুষটা সেই সকালে বেরিয়ে এই সন্ধ্যার পরে ফিরল। শুকনো ক্লান্ত মুখ। এক-একদিন যখন কাজ চাপে এইরকমই হয়।

আরো দু' মাস যেতে এই লোকের মতিগতি সত্যিই জটিল মনে হতে লাগল সোমার। একদিনের এক কথার সঙ্গে অন্যদিনের আর এক কথার সামঞ্জস্য মেলা ভার। সব কথায় নিজের বাহাদুরি নেবার স্বভাব আগে যেমন দেখেছে এখনো তাই। চাকরি বা মাইনের প্রসঙ্গ তুললে দশ রকমের বড় বড় অবান্তর কথা বলে পাশ কাটাতে চেষ্টা করে। বড় বড় থলে বোঝাই রাজ্যের ওষুধ নিয়ে আসে মাঝে মাঝে। তখনই কাজের চাপ দেখে। নিজেই সেগুলো বয়ে নিয়ে কোথায় কোথায় ঘোরে সোমার ধারণা নেই। ও জানত মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভরা ওষুধের স্যাম্পেল আর লিটারেচার নিয়ে দোকানে দোকানে ঘোরে। এত ওষুধ বয়ে বেড়াতে হয় দেখে অবাক। সে সব থলে খালি হতেও দেখে আবার। পকেটে তখন থোকে টাকাও দেখে কিছু। তখন দরাজ হাত, দরাজ মন।

কিন্তু মাস মাইনের নিয়মিত টাকার মুখ সোমা আজও দেখল না। দেহে অশান্তি, মনেও। আগন্তুক আসার ঘোষণা দিনে দিনে জোরালো হয়ে উঠছে। শরীর শীর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। এসময় যেটুকু বিশেষ নজর পেলে উপকার, তা পাচ্ছে না। ওদিকে বাবার মুখেও

দিনকে দিন কেমন যেন ঘোরালো ছায়া পড়ছে। সন্দিগ্ধ চোখে বাবা জামাইকে লক্ষ্য করে। মাসের টাকা সময়ে হাতে পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছে। গেল মাসটাই এমনিতে কেটে গেল। সোমা তাগিদ দিতে অরবিন্দর সেই বড় কথা।—দু-তিন মাসের টাকা একসঙ্গে দিয়ে দেব'খন, প্রতি মাসে এই ঝামেলা ভালো লাগে না।

সত্য হালদার সেদিন মেয়েকে ডেকে বললেন, ও কি চাকরি-বাকরি করে ভালো করে খবর নে তো, দু-পাঁচ কথা কানে আসছে আমার, ভালো বুঝছি না—

লজ্জায় মাথা কাটা গেছে সোমার। মাসের বরাদ্দ টাকা সময় মতো বাবার হাতে এলে কারো কোনো কথা কানে আসত না বলেই বিশ্বাস। ওর মনে হল, দু-পাঁচ কথা কানে আসার কথাটা বাবা বানিয়ে বলল।

রাগও হল। সেই দুপুরেই লোকটার মুখোমুখি একটা বোঝা-পড়ার জন্য এসে দাঁড়াল।

—তুমি চাকরি করছ কি করছ না?

—তার মানে? অরবিন্দর আকাশ থেকে পড়ার মুখ।

—তার মানে তোমাকে আমার বোঝাতে হবে কেন? তোমার চালচলন দেখে লোকের সন্দেহ হচ্ছে—

—কোন্ শালার সন্দেহ হচ্ছে? অরবিন্দর গরম চোখ।

—আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি চাকরি করো কি করো না সেই জবাব দাও।

—আলবৎ করি। এভাবে সন্দেহ করে আমাকে অপমান করার তোমার কি রাইট আছে? তোমার কি চাই তাই বলো।

—আমি সত্যি কথা জানতে চাই। চাকরি যদি করো ছ'মাসের মধ্যে তোমাকে একবারও বাঁধা-ধরা মাইনে আনতে দেখলাম না কেন?

অরবিন্দ হাঁড়ি মুখ করে অন্যদিকে চেয়ে রইল। সোমা আবার বলল, জবাব দিচ্ছ না যে?

—তুমি আমার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছ, এখন আমি কোনো

কথা বলব না।

সোমা গলার স্বর বদলালো এবার। নরম করে বলল, লক্ষ্মীটি, সত্যি কথা বলো। তোমার মনে যদি এ ব্যাপারে অশান্তির কিছু থাকে সব বলে তার ভাগ আমাকেও পেতে দাও।

এই নরম কথা কটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটার অন্য মূর্তি। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো। আর সেই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে সোমার বুকের তলায় যেন মোচড় পড়ল একটা। মনে হল ওই লোকের দুটো চোখে যেন আশ্রয়ের তৃষ্ণা।

—কি হল···বলো ?

—কি বলব ?

—চাকরি করছ ?

—করছি তো।

—সেই বড় মেডিক্যাল ফার্মের চাকরি ?

—তা ছাড়া আর কি।

—ন'শ টাকা মাইনে ?

—হ্যাঁ।

—সে টাকা কি করো ?

—ধার শোধ করতে হয়।

—ধার ! কত ধার ?

—অনেক।

—কেন ধার ?

—লোকের দরকারে দিয়েছিলাম।

সোমা স্তব্ধ খানিকক্ষণ। মুখের দিকে চেয়ে আছে। অরবিন্দ গাঙ্গুলি ওকেই ঠাণ্ডা করার জন্য উদগ্রীব এখন। বলল, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু সত্যি আমি এ পর্যন্ত অনেক লোককে অনেক টাকা দিয়েছি—এখনো কেউ এসে ভেঙে পড়লে না দিয়ে পারি না—মনে হয় আমি নিজেই বুঝি বিপদের মধ্যে তলিয়ে গেলাম—

না, সোমা অবিশ্বাস করেনি। বরুণ চক্রবর্তী সেদিনও বলেছে,

বিপাকে পড়ে কতজনে কত টাকা নিয়েছে অক্রুর কাছ থেকে তুমি ধারণা করতে পারবে না।

কিন্তু নিজের স্বভাবে ফিরতে সময় লাগল না লোকটার। কাছে এসে জোর দিয়ে বলল, তুমি কিছু ভেবো না বুঝলে। আর কিছু দিন সবুর করো—এ শর্মা কি পারে আর কতটা পারে তুমি দেখে নিও।

কতটা বিশ্বাস করল বা করল না ভেবে না পেয়ে সেই বিকেলেই অরবিন্দ জোর করে সোমাকে নিয়ে বাইরে বেরুলো। বলল, এক জায়গায় যাব, চলোই না—

রিকসা থেকে নেমে একতলার একটা ভাঙা দালানের পিছন দিকে ঢুকে গেল ওকে নিয়ে। সামনের দিকটা সেই ক্লাবঘর যেখানে বিয়ের আগে অরবিন্দ থাকত। সেখানে থাকে এক অন্ধ ভদ্রলোক, তার শীর্ণকায়া স্ত্রী আর ভদ্রলোকের বুড়ী মা। বাড়িতে পা দিলেই বোঝা যায় চূড়ান্ত দৈনদশা এদের! পরে সোমা শুনেছে ওই ক্লাবঘরের তিরিশটি টাকা ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল দীপেন ভট্চায। এছাড়া চোখের রোগে অসময়ে রিটায়ার করার দরুণ ভদ্রলোকের ষাটটি টাকা অথর্ব পেনশন সম্বল। এদের তুটো অমানুষ ছেলে আর একটা মেয়ে। চুরি-ডাকাতির দায়ে ছেলে তুটো কোথায় জেল খাটছে এখন কেউ খবর রাখে না। গেল বছর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সেই বিয়েতে অরবিন্দ গাঙ্গুলির কত খসেছে সোমা সেটা জানতে পারল এই বাড়িতে এসে।

ওদের দেখতে পেয়ে শীর্ণকায়া মহিলা ব্যস্তসমস্ত হয়ে সোমার হাত ধরে ভিতরে একটা নড়বড়ে চৌকিতে এনে বসালো। বুড়ীটা দ্রুত এগিয়ে এসে তুজনকেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল। অরবিন্দ গাঙ্গু-লির গলা শুনে অন্ধ ভদ্রলোকও লাঠি ভর করে এসে কাছের একটা ভাঙা চেয়ারে বসল।

চিবুক তুলে মুখের কাছে মুখ এনে বউ দেখল বুড়ী। খেদ আর আনন্দ তুই-ই প্রকাশ পেল মুখে।—এতদিনে বউ দেখানোর সময় হল তোর!···খাসা বউ হয়েছে, সোনা লক্ষ্মী বউ।···কিন্তু মুখ এত শুকনো আর শরীরের এই হাল কেন! পরক্ষণে আনন্দে উদ্ভাসিত।—হ্যাঁ রে

ছোঁড়া, ছেলেপুলে হবে নাকি রে তোর ?

সোমার মুখ লাল। সকলের মুখেই হাসি। অন্ধ ভদ্রলোক কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তার মুখেও হাসি।

অরবিন্দ বলল, বউয়ের মেজাজ-পত্র খুব খারাপ গো বুড়ী মা। টাকা-পয়সা রাখতে পারছি না—

বুড়ী তড়বড় করে বলে উঠল, টাকার জন্য তোর মতো ছেলেকে হেনস্থা করবে মা-লক্ষ্মী আমার এমন মেয়ে নয়। তুই হলি গিয়ে সাক্ষাৎ ভোলানাথ। তোর টাকা থাকে কি করে রে ছোঁড়া—আমার এই মা অন্নপূর্ণা তোকে দু'হাত ভরে দেবে। সোমাকে আদর করে বলেছে, তোমার জন্ম-জন্মের ভাগ্যি গো মা এমন ভোলানাথ পেয়েছ। ও যতো দেবে তোমার দু'হাত ততো ভরে উঠবে---ও যে আর-জন্মে কি ছিল আমার কে জানে---ও না থাকলে আমরা, এই বাড়িঘর আজ শ্মশান হয়ে যেত মা---শ্মশান হয়ে যেত।

অরবিন্দ মুখ টিপে হাসছিল। বলল, তুমি কি বলছ বউ কিছু বুঝতেই পারছে না বুড়ী মা—

—অ্যাঁ ? তুমি বলিসনি বুঝি ? তা বলবি কেন, তুই তো ভোলানাথ—

অন্ধ ভদ্রলোক বলল, বউমাকে শোনাও না মা, আমাদের তো আর কিছু নেই—বলেই শান্তি—

শীর্ণকায়া মহিলা চকিতে ঘর থেকে সরে গেল। বুড়ী বলল, সেকথা মনে হলেও আমার গায়ে কাঁটা দেয় রে বাছা—

টেনে টেনে যে সমাচার বুড়ী শোনালো তারপর গায়ে কাঁটা দেবার মতোই।···দিন চলে না এমন হাল বাড়ির, তার মধ্যে ঘরে সোমত্ত সুশ্রী মেয়ে। শেয়াল-কুকুরের মতো ছিঁড়ে খাবার জন্য ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ায় বখাটে ছোঁড়ারা—চিঠি লেখে রাস্তায় বেরুলে ডাকে, শিস দেয়। মেয়ে দেখে এক জায়গা থেকে এমনি শাঁখা-সিঁদুরে নেবে বলে গেল। সে খবর পেয়ে হাড় হাবাতে পাজিরা সেখানে চিঠি দিয়ে বিয়ে ভাঙলে। তারপর একটা ভালো জায়গাতেই বিয়ে ঠিক হল,

পাড়ার লোকের কথাও তাদের আগে থাকতেই বলে দেওয়া হল। চেনা বর, তারা রাজি, কিন্তু তিন হাজার টাকার কমে সেই বিয়ে নামে না! তিন হাজার টাকা কোত্থেকে আসবে, মেয়ের মায়ের গয়না সব বেচে পাঁচশ টাকা মাত্র ঘরে মজুত। বাড়ির সামনের অংশ বেচে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা হল কিন্তু তিন বন্ধকী বাড়ির অংশ কে কিনবে?

আড়াই হাজার টাকা সংগ্রহ হল না দেখে হতভাগী মেয়ের ওই মা মনের জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে বসল। শিউরে উঠেও হেসে ফেলল বুড়ী।—অভাবের ঘরে শক্ত দড়িই-বা কোথায়, আধ-মরা মা-টা দড়ি ছিঁড়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল। আর তারপর জ্ঞান হতে মাথা ঠুকতে লাগল—মরবেই, ও মাথা ঠুকেই মরবে।

মা-হতভাগী মরতই, কেউ ঠেকাতে পারত না। ঠেকালে ওই ভোলানাথ। কড়কড়ে আড়াই হাজার টাকা হাতে দিয়ে বলল, আর মরে কাজ নেই, এই নাও, নিয়ে মেয়ের বিয়ে দাও—

অরবিন্দ হাসছে তেমনি। সোমা আড়-চোখে না তাকিয়ে পারল না। সেই হাসি দেখে অনেকদিন বাদে আবার চোখ জুড়িয়ে গেল তার।

বাড়ি ফিরে অরবিন্দ খুশি মেজাজে বলেছে, বিশ্বাস হল তো? কাল আবার আর এক জায়গায় নিয়ে যাব।

সোমার মুখে রাগের চিহ্নও ছিল না। জবাব দিয়েছে, আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। এভাবে তোমার মোট কত ধার আছে?

—পাঁচ-ছ হাজার হতে পারে।

ব্যস্ত মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে এক রাশ ফল নিয়ে ফিরেছে। আসার সময় বুড়ী বলে দিয়েছে পোয়াতি বউ, ফল-দুধ খাওয়াবি ভালো করে। শরীরে রক্ত নেই, চেহারা কি হয়েছে দেখিস না!

অতএব সোমার ধারের হিসেবে মন না দিয়ে কটা দিন তার ফল-দুধের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। শ্বশুরকে সোজা গিয়ে বলল, ওর জন্যে একটু ভালো দুধের ব্যবস্থা করে আমাকে বলতে পারতেন, এখন

ব্যবস্থা করুন।

সত্য হালদার চশমার ফাঁক দিয়ে জামাইয়ের মুখখানা নিরীক্ষণ করেছেন একটু। তারপর শ্লেষের সুরে বলেছেন, তুমি এতদিন কি করছিলে, ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিলে? আমার দ্বারা যেটুকু সম্ভব করছি, আর বেশি দরকার হয় নিজে করো।

না, জামাইয়ের ওপরে আদৌ খুশি নন আজকাল তিনি। এমনিতেই সন্দিগ্ধচিত্ত মানুষটা। তাঁর কেবলই মনে হয় গোড়ায় গোড়ায় তাঁর প্রতি ছেলেটার এত আগ্রহ সবই যেন শুধু জামাই হয়ে ঢোকার জন্য। নইলে চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তো এসে দু'দণ্ড বসতে পারে বা দু-পাঁচ কথায় খোঁজ-খবর নিতে পারে। ভদ্রলোকের আবার সেই আগের হাল।

সোমার কথায় কান না দিয়ে আরো কিছু বাড়তি দুধের ব্যবস্থা অরবিন্দই করেছে। সোমা রাগ করে বলেছে, আগে ধার শোধ করো তারপর আর যা কিছু।

অরবিন্দ বলেছে, আগে তুমি তারপর আর যা কিছু।

সোমা বলেছে, আব আমাকে না বলে তুমি নতুন করে কাউকে এক পয়সাও ধার দিতে পারবে না।

অরবিন্দর সেই রকমই জবাব, ধরা পড়ে গেলে নিশ্চয় বলব।

সেই মাস অথবা তার পরের মাসটা আপিসের মাইনের আর খোঁজ করল না বা বাবার তাগিদ এলো না দেখে সে অনেকখানি নিশ্চিন্ত। তাছাড়া এই দেড় মাসে সোমার চেহারা একটু ফিরেছে আর হাসি-খুশিও বেড়েছে দেখে সে মহা খুশি।

।। পাঁচ ।।

কিন্তু ভাগ্যের বিপর্যয় তার শুরু হয়েই গেছে।

···সেদিন বাবার বাইরের ঘর থেকে একটা জোর চেঁচামেচি কানে আসতে সোমা পিছনের ঘুলঘুলির সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর যে-দৃশ্য চোখে পড়ল আর যে কথা কানে এলো তাতে সোমার পায়ের নিচের

মাটি সরে যাচ্ছে যেন। বাবা তার চেয়ারে বসে। অরবিন্দ গাঙ্গুলি একটা অচেনা লোকের দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছে। আর সেই লোকটা চেঁচিয়ে তাকে বলছে, থামবো আবার কি মশাই? আজ দু মাস ধরে তো দেখা হলেই সাতদিনের মধ্যে ফয়সলা করবেন বলে ভোলাচ্ছেন—আধা-আধি বখরায় দুশ টাকার ওষুধ নিয়ে এসেছেন, তার মধ্যে ওষুধও গায়েব টাকাও গায়েব। চালাকি করে নিজের বাড়ির ঠিকানার পর্যন্ত কারচুপি। আজ হয় টাকা ছাড়ুন নয়তো ওষুধ ছাড়ুন—

সত্য হালদার একবার জামাইয়ের মুখখানা দেখছেন আর একবার ওই লোকের।

অরবিন্দ গাঙ্গুলির চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। জবাব দিল, আপনাকে আবার বলছি চেঁচাবেন না, আপনার ওষুধ বিক্রী হয়ে গেছে, তিনশ টাকা আপনার পাওনা হয়েছে, অন্য ওষুধে সে-টাকা আটকে গেছে—টাকা আবার হাতে এলেই পাবেন, আপনাকে ভালো কথা বলছি, এখানে চেচাঁমেচি করবেন না।

—কি? জোচ্চুরি করে আবার চোখ রাঙানি? টাকা আটকে গেছে আপনার? টাকা দিয়ে আপনি ওষুধ কেনার লোক? এই করে আপনি ওষুধের দালালি করবেন ভেবেছেন—

সঙ্গে সঙ্গে গলায় হাত পড়ল। অরবিন্দ গাঙ্গুলি তাকে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে দরজার বাইরে নিয়ে এলো। তারপর টানতে টানতে কোথায় নিয়ে চলল সেই জানে।

সোমার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সে কোনরকমে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। প্রাণপণে তবু সে ভালোর দিকটাই ভাবতে চেষ্টা করছে।···আপিসের মাইনের বেশির ভাগ ধার শুধতেই চলে যায়। হয়তো এ-টাকা দায়ে পড়ে খরচ করেছে। ওর জন্যেও তো এখন বেশ বাড়তি খরচ হচ্ছে। আর পারে না বলে একটা ঠিকে রাঁধুনি পর্যন্ত রাখা হয়েছে···

···কিন্তু লোকটা দুপুরের মধ্যে আর ঘরে এলো না। ওর সামনে দাঁড়াল না। নিঃশব্দে খাওয়া সেরে ওর চানের ফাঁকে নিজের মোটা

ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেল।···ওই মোটা ব্যাগে ওষুধ থাকে, থলে বোঝাই ওষুধও ঘরে দেখেছে। এগুলো কেন আসে কোথায় যায় সোমার কাছে এতদিনে তা স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাতেই-বা খারাপ কি। শুধু চাকরির ওপর নির্ভরশীল নয়, একবার বাজারে বেরুলে অনেক টাকা ঘরে আনতে পারে—এ বড়াই তো নিজের মুখেই কত করেছে। সোমা এত ভাবছে কেন?

বাবা বাড়ি নেই সেই থেকে। কোথায় গেছে জানে না। খেয়ে বেরোয়নি পর্যন্ত। মনের অশান্তি বেড়েই চলেছে সোমার। বাবাও কক্ষনো এ-রকম করে না।

সত্য হালদার রোদে তেতে পুড়ে ফিরলেন বেলা দেড়টার পর। বাড়িতে পা দিয়েই হুংকার ছাড়লেন, কোথায়—কোথায় সেই রাস্কেলটা?

সোমা কোনরকমে এসে দাঁড়াল। বুকের তলায় আবার কাঁপুনি ধরেছে। কিন্তু মেয়ের শুকনো মুখ চোখে পড়ল না সত্য হালদারের। বলে উঠলেন, ও কত বড় ভাঁওতাবাজী করে তোকে বিয়ে করেছে জানিস? চাকরি-টাকরি কিচ্ছু করে না। আমি নিজে গিয়ে সেই ওষুধের কোম্পানীতে খোঁজ করে এলাম। চাকরি করত। ওই কি-সব ভাঁওতাবাজী ধরা পড়তেই সেখানকার চাকরি গেছে। তোকে বিয়ে করার আগে থেকেই ওর চাকরি নেই। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের যে কটা টাকা হাতে পেয়েছিল তাই দিয়েই তখন ফুটানি করে কাটিয়েছে, চালবাজী করেছে। ওর খবর করতে ওর সেই পুরনো আপিসের লোক হাসে। একজন তো ঠাট্টাই করে বসল, মেয়ে বিয়ে দেবার ইচ্ছে নাকি মশাই—হঠাৎ অরবিন্দ গাঙ্গুলির খোঁজ-খবর কেন? ও এখন শুধু ওষুধের দালালি করে—বুঝলি? পাঁচ জায়গার অনামী ওষুধ এনে মুখবাজী করে মফঃস্বলের আর পড়ো জায়গার ওষুধের দোকানে ঝেড়ে দিয়ে আসে—বুঝলি? আমার মতো বোকা গাধা তো আর কম নেই এ-রাজ্যে—লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ও খায়—বুঝলি?

জমি বেচে এত ঘটা করে কত আশা নিয়ে ছোট মেয়ের বিয়ে

দিয়েছিলেন ভদ্রলোক, তাঁর ক্ষেপে ওঠা স্বাভাবিক।

সোমা ঘরে এসে আবারও শুয়েই পড়ল।

সকালের গণ্ডগোলটাই সব ধরে নিয়েছিল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। রাতের আহার সমাধা হবার আগে কেউ একটি কথাও বলেনি তাকে। এ-বেলাও একলা বসে খেয়েছে। শ্বশুর বাইরের ঘরে বসে তখন, সোমাও ঘর ছেড়ে বেরোয়নি।

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। সোমা এখন আর শুয়ে নেই। খাটের বাজু ধরে তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে মনে হল।

অরবিন্দ হাসতে চেষ্টা করে বলল, সামান্য ব্যাপারে বাপ-মেয়ে তুজনেই বেজায় চটেছ দেখছি—

সোমা ফুঁসে উঠল, সামান্য ব্যাপারে—কেমন?

—তাছাড়া আর কি। ওই লোকের টাকা আমি সাত দিনের মধ্যে শোধ করে দেব দেখো—তখন আবার হাতে-পায়ে ধরবে—

—হাতে-পায়ে ধরবে! তোমার? কেন হাতে-পায়ে ধরবে—ভাঁওতাবাজী করে অচল ওষুধ চালাতে পারো—সেই জন্যে?

অরবিন্দ গাঙ্গুলি জোর দিয়ে বলল, চাকরির বাইরে আমি ওষুধ কেনা-বেচা করি সকলেই জানে—অচল ওষুধ বা ভাঁওতাবাজীর খবর কে দিলে?

চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে আগুন ঝরল সোমার।—কি বললে? চাকরির বাইরে ওষুধ কেনা-বেচা করো তুমি? চাকরি—চাকরি! চাকরি করো তুমি?

—বা রে, করি না কে বলল?

সোমা তার মুখটা দগ্ধে নিল একপ্রস্থ।—বাবা। বাবা বলেছে। বাবার সন্দেহ হতে তোমার সেই বড় কোম্পানীতে খবর নিতে গেছল। বিয়ের ঢের আগে থেকেই তোমার চাকরি নেই সে-খবরও জেনে এসেছে। চাকরি থেকে তোমাকে তাড়ানো হয়েছে।

অরবিন্দর প্রতিবাদ করার ইচ্ছে, কিন্তু স্ত্রীর এই মূর্তির দিকে চেয়ে মুখে আর কথা সরল না।

—কি ? এখন কি বলবে ? এখন কি বলার আছে তোমার ?

আমতা আমতা করে অরবিন্দ গাঙ্গুলি বলল, ইয়ে, চাকরি নেই তাতে কি হয়েছে, তুমি যদি ঘৃণা না করো, তুমি যদি সদয় থাকো—ও-চাকরির থেকে ঢের বেশি রোজগার করব আমি, দেখে নিও।

এ-রকম বড় কথা অনেক শুনেছে। আবার কি মনে পড়তে আরো বেশি রাগ, আরো বেশি যন্ত্রণা। আবার ফুঁসে উঠল, এই সেদিনও তোমার চাকরি নিয়ে আর মাইনে নিয়ে এত কথা জিজ্ঞেস করলাম, মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি একের পর এক মিথ্যে কথাগুলো বলে গেলে ? লজ্জা করে না তোমার এখন কথা বলতে ?

কোণঠাসা হয়ে অরবিন্দ গাঙ্গুলি বলে উঠল, লজ্জা তো করছে—তোমরাই তো ঘাঁটাঘাঁটি করে গণ্ডগোল পাকাচ্ছ ! সেদিন সত্যি কথা বললে তোমার কি রাগ কম হত, তাছাড়া এরই মধ্যে ধরা পড়ে যাব তা-ই বা কে জানত।

একে শরীর বেতালা, তার উপর এতবড় মিথ্যোচারের যন্ত্রণা। সোমার মাথাই খারাপ হবার দাখিল। লোকটাকে যেন নতুন করে আবার দেখে নিচ্ছে সে। অথচ আশ্চর্য, মুখের দিকে তাকিয়ে ভিতরটা কেমন খচখচ করে উঠল। একটা অসহায় শিশু যেন বেকায়-দায় পড়ে হাঁসফাঁস করছে এখন।

রাগ সামলাতে চেষ্টা করল সোমা। থমথমে মুখ।—এত বড় মিথ্যের আশ্রয় তুমি কেন নিলে ?

অরবিন্দ চুপ।

—কেন—কেন এত বড় একটা মিথ্যের মধ্যে ঢুকলে তুমি ?

আত্মপক্ষ সমর্থন না করে উপায় নেই যেন অরবিন্দ গাঙ্গুলির।—গোড়া থেকে সত্যি কথা বললে তোমাকে পেতাম না, চাকরি নেই জানলে তোমার বাবা তোমাকে আমার হাতে দিত ? তুমিই কি আমাকে বিয়ে করতে চাইতে ? এদিকে রাস্তায় তোমাকে দেখে দেখে আর বরুণের মুখে তোমার কথা শুনে শুনে তোমাকে পাবার চিন্তায় রাতে আমার ঘুম হত না—যত ভাবতাম ততো মনে হত শুধু তোমাকে

পেলেই আমার কেউ না থাকার অভাব ঘুচে যাবে—এরপর মিথ্যের মধ্যে ঢোকা ছাড়া আর আমার কোনো উপায় ছিল ?

সোমার অপলক দুই চোখ তার মুখের ওপর। এ-রকম জবাব ও জীবনে শোনেনি, আশাও করেনি। মনে হল, এ-রকম বিপাকে পড়ার পর এবারে সত্যি কথাগুলোই যেন ভিতর থেকে নিংড়ে বেরিয়ে এলো। ওই মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ হেসে ফেলাও বুঝি বিচিত্র ছিল না সোমার। এরপর কি করবে বা কি বলবে ভেবে না পেয়ে ও নিজেই হনহন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রাতটা প্রায় বিনিদ্র কাটল। কিন্তু ওই লোক পাশে শুয়ে দিব্বি ঘুমুচ্ছে। এ-রকম মানুষকে নিয়ে ও কি করবে. আবার ছেঁটেই বা দেবে কেমন করে ?

সংকট এলে সেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টাটাও সহজাত। পরদিন খেয়ে-দেয়ে কাজে বেরুবার মুখে সোমা আবার আটকালো তাকে।

—কোথায় যাচ্ছ।

হাতে মোটা ব্যাগ। থতমত খেয়ে জবাব দিল, কাজে···

সোমা বলল, ওই ব্যাগ হাত থেকে নামাও। আমার কথার সত্যি জবাব দাও আগে। ওষুধের সেই বড় কোম্পানী থেকে তোমার চাকরি গেছল কেন ?

—কেন আর, বনিবনা হত না।

—সত্যি কথা বলো. বাবা শুনে এসেছে তোমার দোষেই তোমাকে তাড়িয়েছে তারা।

—বা রে, বনিবনা না হওয়াটাই তো দোষের। দয়ামায়া নেই এমন সংস্পর্শে এলেই আমার রাগ হয়—ওরা ভয়ানক নির্দয়।

সোমা অবিশ্বাস করল না। এই মানুষ স্নেহের কাঙাল জানে। বলল. ঠিক আছে এই অচল ওষুধ বেচার কাজ তোমাকে ছাড়তে হবে, এম-এসসি পাস যখন, চেষ্টা করলে ভালো কাজ নিশ্চয় পাবে।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি সত্যি অবাক।···এগুলো অচল ওষুধ মানে ?

—ওগুলো কি তাহলে ? বাজারে চলে ?

—চালাতে হয়। সব ওষুধই চালাতে হয়। বড় ওষুধের কোম্পানী তাদেরটা চালাবার জন্যে রিপ্রেজেনটেটিভ রাখে, টালাও বিজ্ঞাপন করে —ছোট ওষুধের কারবারীরা আমাদের মতো লোক দিয়ে তাদের ওষুধ চালায়। ছোটখাট জিনিস তৈরি করে সাধারণ গরিব আর মধ্যবিত্তদের মধ্যে চালাতে চেষ্টা করে—এও তেমনি। অচল ওষুধ বলতে তুমি কি ভেজাল বা জাল ওষুধ-টষুধের কথা ভাবছ নাকি?

সোমা অনেকটা সেই রকমই ভাবছিল।

—কি কাণ্ড, তাহলে সকলের নাকের ডগা দিয়ে ও-সব বিক্রী করলে এতদিনে আমার জেল হয়ে যেত না? ছোটখাট ব্যবসা ফেঁদে কত লোক খিদের ওষুধ হজমের ওষুধ অম্বলের ওষুধ থেকে শুরু করে কত কি বার করছে। আমার মুখের জোরে সেই সব ওষুধের মান বাড়িয়ে পাইকেরি হারে বেচার ব্যবস্থা করি—সকলেরই কি নামী ওষুধের পিছনে ছোটার অবস্থা নাকি?

ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝল সোমা। তবু বলল, কিন্তু এম-এসসি পাস করেছ—এর থেকে ভালো কিছু করতে পারো না?

—এম-এসসি পাশের কি দাম, মুরুব্বির জোর থাকলে তবে কথা। এম-এসসি পাস করে বড় জোর মফঃস্বল শহরে দুশ টাকা মাইনের একটা স্কুল মাস্টারি জোটানো যায়—মুখের জোর থাকলে তার থেকে এটা ঢের বেশি লাভের কাজ—বুঝলে?

কি পরামর্শ দেবে সোমা সঠিক ভেবে পেল না। তখনকার মতো চুপ করে গেল।

কিন্তু সত্য হালদার চুপ করে বসে নেই। ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। জমি বিক্রীর এত টাকা খরচ করে এ কোন্ প্রবঞ্চকের হাতে মেয়ে সঁপে দিয়েছেন ভেবে অস্থির।

পরদিনও খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে গেছেন তিনি। ফিরেছেন বেলা তিনটের পরে। রাগে দুঃখে কাঁদ-কাঁদ মুখ। মেয়ের কাছে এসে ভেঙেই পড়লেন তিনি।—আমরা একটা আস্ত জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছি রে

সোমা—সর্বনাশ হয়েছে।

সোমার সমস্ত মুখ বিবর্ণ, পাংশু। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে আবারও। নতুন করে কি হল জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না।

আধা ক্ষিপ্ত স্বরে সত্য হালদার বলে উঠলেন, কোম্পানী থেকে ওই উল্লুকটার চাকরি কেন গেছে জানিস? শুনবি? নিজেকে এম-এসসি পাস বলে জাহির করে চাকরি নিয়েছিল, তারপর সার্টিফিকেট না দেখিয়ে কি-সব তালিবালি করে চাকরিতে কনফার্মডও হয়ে গেছল—কিন্তু কাদের সব চিঠিপত্রে ধরা পড়ে গেল, আসলে ও গ্র্যাজুয়েটই না—বি-এসসি পরীক্ষাই দেয়নি। কোম্পানী ওকে জেলে না পাঠিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েছে।

সোমা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুনছে।

নিস্পন্দের মতো শুনেই যেতে লাগল।

—বাবা খুব ভোরে উঠে ওদের শিয়ালখেদার পৈতৃক বাড়িতে চলে গেছল। একবার সন্দেহ হতে সব খবর নেবার জন্য ছুটে না গিয়ে পারেনি। সেখানে ওদের বড় দালান-টালান কিছু নেই, সাদামাটা খানকতক ঘর। সেও পৈতৃক বাড়ি নয়—অরবিন্দর দুই দাদা করেছে। ওর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে শিয়ালখেদা থেকে দাদারা ওকে শেয়াল তাড়ানোর মতো করেই তাড়িয়েছে। চাকরি পাওয়া আর চাকরি খোয়ানোর পরে সেখানে দিগ্বিজয় করে বেড়াচ্ছিল। চাকরি কেন গেছে তারাই জানিয়েছে। চাকরি যখন করত তখন লাট সাহেবের মতোই খরচ করত, দান-ধ্যানের বাহাদুরি নিত। হাতে কিচ্ছু রাখেনি। চাকরি যাবার পর দাদাদের নাম করে টাকা ধার করে বেড়াতো। ওই দাদারাই উল্টে ধমকেছে বাবাকে। বলেছে, লোকে মেয়ে বিয়ে দেবার আগে খোঁজ-খবর নেয় আর আপনি হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিয়ে তারপর খবর নিতে এলেন?

সেখান থেকে মাথা খারাপ করেই বাবা ঘরের দিকে ফিরছিল। পথে বরুণ চক্রবর্তীর ঘর। সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখেও বাবার মাথায় রক্ত উঠেছে। মনে পড়েছে, প্রথম দিন এসে তার

সামনেই জামাই নিজেকে এম-এসসি পাস বলে জাহির করেছিল আর ন'শ টাকা মাইনের চাকরি করে বলেছিল।

সোজা তার ঘরে উঠে গিয়ে বাবা বলেছে, জোচ্চুরির আর জায়গা পাওনি তোমরা ? তোমার বন্ধু এম-এসসি পাস ? আর ন'শ টাকা মাইনের চাকরি করে—কেমন ?

শুনে ওই লোকটা নাকি আকাশ থেকে পড়েছে। পরে বলেছে, বিয়ের আগে সে-ও জানত বন্ধু ওমুক কোম্পানীতে ন'শ টাকা মাইনের চাকরি করে আর সেই সঙ্গে অন্য ওষুধের এজেন্সিও নিয়েছে। বিয়ের অনেক পরে দীপেন ভটচাযের কাছে শুনেছে চাকরি করে না। অবাক হয়ে বাবাকেই জিজ্ঞাসা করছে, কিন্তু এ-সব কি বলছেন—অরু এম-এসসি পাস নয় ?

বাবা ক্ষিপ্ত।—এম-এসসি পাস কি কি-পাস তুমি জানো না ?

সে বলেছে, আমি কি করে জানব, স্কুলের পরে তো কত বছরের ছাড়াছাড়ি—আমাকে নিজের মুখে বলেছে এম-এসসি পাস—স্কুলে ভালো রেজাল্ট করত, অবিশ্বাস করব কেন !

বাবার আবার কি মনে পড়েছে। বলেছে, তুমিও তো নিজেকে বি-এ পাস বলে জাহির করেছিলে, তোমার কথা বিশ্বাস করব কি করে।

শুনে লোকটা নাকি হা করে খানিকক্ষণ চেয়ে ছিল বাবার মুখের দিকে। তারপর চুপচাপ বাক্স খুলে একটা সার্টিফিকেট বার করে এনেছে। বাবা স্বচক্ষে সেই সার্টিফিকেট দেখে এসেছে, বরুণ চক্রবর্তীর ডিগ্রী সার্টিফিকেট।

...হ্যাঁ, সোমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। বরুণ বি-এ পাস নয় বলে ফেলার পর মুখে বিড়ম্বনার মুখোস এঁটে অরবিন্দ গাঙ্গুলি হাত জোড় করে বাবাকে বলেছিল, কথা দিন এ নিয়ে আপনি ওকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করবেন না—মাঝখান থেকে আমি অপ্রস্তুতের একশেষ হব।

মিথ্যে মিথ্যে ! সুপটু হাতে এই ঘরের লোকই শুধু মিথ্যের জাল বুনে গেছল সেদিন। আর বাবা-মেয়ে দুজনেই সেই মিথ্যের জালে আটকেছে।

প্রতীক্ষা। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে সোমার। অকরুণ কঠিন প্রতীক্ষার মুহূর্ত গুণে চলেছে তারপর থেকে।

রাত আটটা নাগাত ফিরেছে টের পেল। ওদিক থেকে বাবার আগুন-ঝরা শ্লেষ কানে এলো। এই যে বাবাজীবন, এরপরেও তুমি আবার মুখ দেখাতে এসেছ তাহলে? আসতে পেরেছ?

যাকে বলা হল তার গলাও কানে এলো।—কি হয়েছে?

—কি হয়েছে? এমন কিছু না! আজ সকালে আমি তোমাদের শিয়ালখেদার সেই মস্ত প্রাসাদ থেকে ঘুরে এলাম। সেখানে তোমার দাদাদের সঙ্গে দেখা হল, কথা হল। কি-রকম এম-এসসি পাস তুমি, কি করে তোমার চাকরি গেল আর সেখানে কি-সব কীর্তি তোমার—সব শুনে এলাম।

—কি লাভ হল আপনার এ-সব শুনে এসে! ক্লান্তি মেশানো বিরক্তির স্বর।

বাবা চারখানা হয়ে ফেটে পড়ল।—কি লাভ হল! পাজী জোচ্চোর ছুঁচো কোথাকারের! তোমাকে আমি বাড়ি থেকে দূর করে তাড়াব—তোমাকে আমি জেলে দেব।

আর না দাঁড়িয়ে লোকটা সোজা ভিতরে চলে আসছে টের পেল সোমা।

এলো। শুকনো ক্লান্ত মুখ। হাতের মোটা ব্যাগটা এক কোণে রেখে হাসতে চেষ্টা করল একটু। ঘোরালো অবস্থাটা বুঝছে। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কতকগুলো ভাঁজ-করা নোট বার করে সোমার দিকে বাড়িয়ে দিল।—ছ'শ পঁচাত্তর আছে এখানে, রাখো রাখো।

টাকাটা নিয়ে সোমা সজোরে ছুড়ে মারল তার গায়ে। নোটগুলো গায়ে লেগে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।—টাকা! মিথ্যোবাদী, তুমি টাকা দেখাতে এসেছ এখন আমাকে! বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে, যাচ্ছ না কেন? কোন্ মুখে তুমি আবার এসে এখানে দাঁড়িয়েছ।

—কি মুশকিল? বিড়ম্বনায় ছাওয়া ক্লান্ত মুখ অরবিন্দর।—নতুন করে তো দোষ করিনি—যা শুনেছ সব তো সেই পুরনো ব্যাপার!

—পুরনো ব্যাপার? এম-এসসি পাশের কথায় কাল পর্যন্ত সামনে দাঁড়িয়ে তুমি একগাদা মিথ্যে কথা বলে যাওনি? কেন—কেন তুমি আমার এমন সর্বনাশ করলে?

একটা ছোট ছেলে কোনো বয়স্কজনের অবুঝপনা দেখলে যেমন হয় তেমনি মুখ অরবিন্দ গাঙ্গুলির।—সর্বনাশ করলাম! তুমি কাল জানতে আমি এম-এসসি পাস আর আজ জানলে তা নয়—তাতেই মানুষটা আমি তফাত হয়ে গেলাম? আমার রক্ত-মাংস হাড়-মজ্জা বদলে গেল?

—গেল। সম্ভব হলে সোমা ওই হাড়-মাস ছিঁড়ে আনে।—কেন তুমি একের পর এক মিথ্যে বলে এ-রকম ভাঁওতা দেবে?

রাগত মুখে অরবিন্দও জবাব দিল, বলেছি তো সব তোমার জন্যে—তুমি বি-এ পাস আর আমি গ্র্যাজুয়েটও নই জানলে তোমার বাবা আমাকে ধারে-কাছে ঘেঁসতে দিত না, তুমি দিতে? যা করেছি সব তোমার জন্যে করেছি, বাস!

না, সোমা আর পারেই না, এ-রকম কথা অনেক শুনেছে। তবু ঝলসে উঠল, আমার জন্যে? এম-এসসি পাশের ভাঁওতা দিয়ে তুমি চাকরি জোটাওনি?

—সেটা চাকরির জন্য। তা না হলে চাকরি হত না।

—সে চাকরি হয়ে তোমার কি লাভ হল? থাকল! আমিও থাকছি না, তুমি দূর হয়ে যাও আমার চোখের সমুখ থেকে। এতবড় নির্লজ্জ বেইমান তুমি, ওই বি-এ পাস বরুণ চক্রবর্তীকে তুমি বি-এ ফেল সাজিয়েছিলে!

ধৈর্য কমছে অরবিন্দ গাঙ্গুলিরও, গজগজ করে জবাব দিল, তোমার জন্য বাবার চোখ ছিল ওর দিকে—তাই করেছি।

—তাই করেছ? ঠিক আছে—এখন যাও এ-ঘর থেকে—যাও বলছি!

—যাঃ বা-বা, যার জন্য এত করলাম,···ঠিক আছে, আজ না-হয় আমি বাইরের ঘরেই থাকছি, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা হলেই দেখবে এত রাগারাগির কিছু হয়নি—যেমন ছিল সব ঠিক তেমনিই আছে।

রাগ যতই হোক, সত্য হালদারের বাস্তব বুদ্ধি কম নয়। ছোট জামাই তাঁকে সর্বস্বান্ত করেছে ভাবছেন, কিন্তু মেয়ের এ-অবস্থায় লোকটাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চান না। অনেক খরচ আর অনেক ঝামেলা।

এরপর সমস্ত ব্যবস্থার জন্য জামাইকে তিনি হুমকি দিয়ে বলা শুরু করলেন। অরবিন্দ যেটুকু সম্ভব করে, না পাবলে তার কানে তুলো পিঠে কুলো।

এদিকে সোমার ভিতরটা জ্বলেই গেছে বুঝি। এই লোকের সঙ্গে এক শয্যায় রাত কাটাতেও সে রাজি নয়। প্রথম দু-রাত সে বালিশ মাটিতে ফেলে ভূমিশয্যা নিয়েছিল। শেষে অরবিন্দই বলেছে, থাক বাবা, আমিই মাটিতে শুচ্ছি, তুমি তোমার খাটে থাকো।

সেই থেকে পৃথক শয্যা দুজনের।

সমস্ত মন বিষিয়েছে সোমার। সমস্ত অস্তিত্ব যেন আলো-বাতাস শূন্য হয়ে গেছে তার। হতাশায় ভরে গেছে। এই হতাশার পরিণাম ক্রোধ। আরো রাগ এইজন্যে যে, মানুষটাকে বরদাস্ত করতে পারছে না আবার এই সংকটে তাকে দূর করে তাড়াতেও পারছে না।

শরীরের এই সময় তার দুই দিদি এসেছে থাকবে বলে। সত্য হালদারই আনিয়েছেন তাদের। তাদেরও জানতে বাকি থাকেনি কিছু। উনিই বলেছেন। ছোট বোনটার দুর্ভাগ্য দেখে তারা হায় হায় করেছে। সোমার তাতে আরো বেশি যন্ত্রণা, আরো বেশি রাগ।

বোনেরা আসার ফলে অরবিন্দর রাতের শয্যা বাইরের ঘরে চালান দেওয়া হয়েছে। রাতে চেয়ার-টেবিল সরিয়ে নিজের বিছানা নিজেকেই করে নিতে হয় তার।

ঠিক এই সময় পরপর দুটো অঘটনের খবর কানে এলো সোমার। এ-সব কলোনীতেও রাজনীতির হানাহানি লেগেই ছিল। নিত্যি খুন-জখমের খবর কান-সওয়া হয়ে গেছল। এর মধ্যে পুলিসের গুলি খেয়ে দীপেন ভট্চায মারা গেল। হাসপাতালে দুদিন বেঁচে ছিল লোকটা।

অরবিন্দকে বলেছিল, যারা থাকল তাদের দেখিস একটু।

দুর্ভাগ্য তার দোসর নিয়ে আসে। দিনকতক না যেতে বীণা ভট চাযের বাপটাও লরি চাপা পড়ে অপঘাতে মরল। এই দু-দুটো অঘটনের সময় এই লোকের আবার আর এক মূর্তি লক্ষ্য করেছে সোমা। যেন তার নিজেরই হাড়-পাঁজর দুমড়ে ভেঙেছে এমনি দিশেহারা অবস্থা।

সোমা ঠিক জানে সে-সময় বহু টাকা খরচ হয়ে গেছে এই লোকের। থোকে থোকে টাকা আনতে দেখেছে, ফুরোতে দেখেছে। আবার কোথায় ধারে ভলিয়ে টাকা সংগ্রহ করছে জানে না। জিজ্ঞাসাবাদের রুচিও নেই। কিন্তু বাবা ছাড়েনি, বলেছে, অন্যের ব্যাপারে যে এ-রকম নেচে বেড়াচ্ছ, সামনে যে খরচ আসছে তার ব্যবস্থা করেছ?

জবাব দিয়েছে, আমি একবার নেচে বেড়িয়ে যে ব্যবস্থা করতে পারব আপনার ওই হোমিওপ্যাথির আলমারি বেচে দিলেও তা হবে না।—আমার ব্যবস্থা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না!

বাবা ক্ষিপ্ত।—চোপ, রও? জোচ্চুরি করে আবার বড় বড় কথা। দেব বাড়ি থেকে দূর করে তাড়িয়ে!

তার পরেও জবাব।—সময় হলে একেবারে সব নিয়েই যাব—আপনার মতো মানুষের কাছে কাউকে ফেলে রেখে যাব না। এ শর্মাকে চেনেন না!—

এ-সব কথা কানে এলে সোমাও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে দূর করে তাড়িয়ে দেয়। পারে না বলেই আরো রাগ।

মিথ্যে বড়াই করেনি। ধার করে হোক বা যে করে হোক ডেলিভারির সময়েও দু'হাতে খরচ করেছে। আর সেই সময়ে লোকটার উদ্বেগও যে লক্ষ্য করেনি এমন নয়। পাঁচ টাকা দরকার হলে দশ টাকা বার করে দিয়েছে।

ছেলে হয়েছে। সেই আনন্দ ধরে না। এগারো দিন বাদে অশৌচান্তের স্নানের পরে মাসির কোলে ছেলেকে ভালো করে দেখেছে আর মিটিমিটি হেসেছে। শেষে মন্তব্য করেছে, নাঃ, আমার মতো হল না,

তোমার মতোই মনে হচ্ছে। অর্থাৎ মায়ের মতো।

মাসি অমনি সশ্লেষে বলে উঠেছে, থাক, আর তোমার মতো হয়ে কাজ নেই।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি পারলে ওই মাসিকে দু'চোখে গিলে খায়। ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

মাসি মুখ ঝামটা দিয়েছে, ওঃ! আবার রাগ!

মানুষটাকে বরদাস্ত করতে পারে না সোমাও। কিন্তু দিদির আচরণও তার ভালো লাগেনি।

•

ছমাস পেরুতে ছেলের অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থাও সোমার হুকুম মতো করতে হয়েছে। টাকা আমদানীতে ভাঁটা পড়ে আসছে সোমা টের পায়। কিন্তু তার মায়াদয়া গেছে। ও ঠিক জানে এই অবস্থার মধ্যে বীণা ভট্টাচার্য আর তার মাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে চলেছে লোকটা। ওই মা-মেয়ে প্রায়ই আসে আজকাল এ-বাড়িতে। মা-টা তো সোমাকে দস্তুর মতো তোয়াজ-তোষামোদই করে। আর অরু—অরুর সম্পর্কে এমন উচ্ছ্বাস দুজনেরই, যেন এমন ছেলে অর্ডার দিয়ে ছাড়া তৈরি হয় না। এত উচ্ছ্বাসের কারণ বুঝতে পারে সোমা। বীণার মায়ের মতলবও আঁচ করতে পারে। ওকে অনেকদিন বলেছে, তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো যদি মেয়েটার কোনো গতি হয়। আসলে তার এখন বরুণ চক্রবর্তীর দিকে চোখ! সোমা একটু বললে বরুণ চক্রবর্তী নাকি রাজি হয়ে যেতে পারে। এ প্রস্তাব নিশ্চয় এখান থেকেই গেছে। কিন্তু সোমা কেন যেন বিরূপ ওই মেয়েটার ওপরে। তার চটক একটুও ভালো লাগে না।

তাছাড়া নিজের জ্বালায় জ্বলছে কার কথা ভাবতে যাবে ও। বরুণ চক্রবর্তী মাঝে মাঝে আসে। বাবার কাছে এখন আবার তার একটু খাতির-যত্ন বেড়েছে। মাছের ব্যবসায় উন্নতি করছে। সোমাও তার ওপর বিরূপ নয় এখন আর। বরং একদিন তার ওপর অবিচার করা হয়েছিল বলে সে এলে ঘরে ডেকে বসতে বলে, চা-টা করে খাওয়ায়।

কিন্তু মেজাজ এখন সর্বদা এমনই তেঁতে থাকে সোমার যে বরুণ চক্রবর্তীও তাকে ভয়ের চোখেই দেখে।

ছেলের অন্নপ্রাশনে দিদিদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। আর বরুণ চক্রবর্তীকে। ওদিকে অরবিন্দ নিজে থেকেই বীণা আর তার মাকে নেমন্তন্ন করে এসেছে। মন-মেজাজ এ দিনটায় ভালো রাখতেই চেষ্টা করেছে সোমা। বরুণ আসতে বীণাকে দেখিয়ে সোমা চুপি চুপি বলেছে, পছন্দ হয় কিনা ভালো করে দেখুন—আপনার জন্য আমাকে বড় জ্বালাচ্ছে ওরা।

বরুণ হেসে জবাব দিয়েছে, দেখাই তো আছে, নতুন করে আর কি দেখব।

সোমা ভ্রুকুটি করেছে।—দেখা আছে মানে? কতটা দেখা আছে?

আমতা আমতা করে বরুণ জবাব দিয়েছে, বেশি না—কিন্তু আমি তো এখনো সেই মাছের ব্যবসাই করি!

পরে যে লোকটা অনেকবার আড়ে আড়ে বীণাকে দেখে চলেছে, তার সঙ্গে দুটো কথার সুযোগ খুঁজেছে সোমার তাও চোখ এড়ায়নি। তাই দেখেও ভিতরটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে কেমন। মনে হয়েছে, যত দুরবস্থাতেই পড়ুক ওই মেয়ের তবু সুখের আশা আছে, কিন্তু ওর নিজের কোনো আশার ছিটেফোটাও নেই।

একটা বিতিকিচ্ছিরি রাগারাগিতে শেষ হয়েছে সেই অন্নপ্রাশনের দিনটাও। মাছ পর্যাপ্ত হয়নি, দই-মিষ্টিও সোমার মতে যথেষ্ট নয়। অতিথিরা চলে যেতে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল করেছে ঘরের লোককে। বলেছে, টাকা আসবে কোথা থেকে, বদান্য করে আর এক জায়গায় টাকা ঢালছ আমি জানি না!

এর কিছুদিনের মধ্যেই সেই গানের মাস্টারের সঙ্গে বীণা ভট্টাচার্য উধাও। তার মা এসে কেঁদে পড়তে এই লোককেই যেন ভীষণ সংকটে হাবুডুবু খেতে দেখেছে। উদ্ধার করে আনার পর আবার সে-কি আনন্দ! বারবার ওকে বলেছে, মেয়েটার এবার চোখ খুলেছে বুঝলে—রাতারাতি বদলে গেছে।

এত মাখামাখি দেখে সোমার মনে আবার একটু একটু করে যেন বিষ ঢুকছে। এই লোকের সেই তৃষ্ণার রূপ জানে। একটুখানি স্নেহের জন্য কাঙালপনা জানে। না, সোমা আর তাকে পাত্তা দেয় না বড় একটা। কাছে আসতে চাইলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে চায়। একটা ছেলে এসেছে, এটাকে নিয়েই কি হবে জানে না—আবার কোনো হঠকারিতার ব্যাপারে ও নির্মম—কঠিন। কিন্তু নিরাপত্তা বজায় রেখেও যেটুকু বিনিময় সম্ভব, সোমা লোকটার সেটুকু আনন্দের তৃষ্ণাও রূঢ় মেজাজে বাতিল করে দেয়। অরবিন্দ গাঙ্গুলি অনুনয় করে, রাগ করে, শাসায়। কিন্তু ওসবের আর কানাকড়িও দাম দেয় না সোমা। কচিৎ কখনো নিজের সাময়িক দুর্বলতা ভিন্ন তাকে ধারে-কাছে ঘেঁসতে দেয় না। তবু লোকটার বেহায়ার মতো হামলার চেষ্টা।

এই লোক দিন-রাতের একটা দীর্ঘ সময় বীণাদের বাড়িতে পড়ে থাকে। সেখানে যত্ন-আত্তি পায় জানা কথাই। পাবে না কেন, টাকা তো যা পারে ঢালছেই। কিন্তু স্বভাব যার এ-রকম, তলায় তলায় সে কোন্ মতলবে আছে কে জানে? এই লোককে আর কি করে বিশ্বাস করতে পারে সে?

বিশ্বাস করে না!—কিন্তু মুখেও এ নিয়ে বলে না কিছু। বলতে রুচিতে বাঁধে। এমন একজনের খপ্পরে পড়ে অনেক নেমেছে, আর কত নামবে?

রোজগারের ব্যাপার নিয়েই খিটির মিটির বাঁধছে সব থেকে বেশি। ধারে দেনায় তলিয়ে আছে তাও আঁচ করতে পারে। ওষুধ বিক্রীর রোজগারও কমে আসছে? বিক্রীর টাকা খেয়ে বসে থাকে বলে লোকে হয়তো বিশ্বাসও করে না আর। আগের মতো স্নেহ মায়া দরদ পেলে যে উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে পারত অরবিন্দ গাঙ্গুলি, তাও নেই। সেও যেন আস্তে আস্তে গা ছেড়ে দিচ্ছে। বকাবকি গালিগালাজ কানে ঢোকে না। আগে সিগারেট খেত খুব। এখন বিড়ি ধরেছে। দুপুরে কোথায় তাসের বাজী খেলতে যায় তাও সোমার কানে এসেছে। এ-শোনার পর সোমা যে ব্যবহার করেছে, গায়ে মানুষের চামড়া থাকলে

বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। পাওনাদারদের কেউ কেউ বাড়িতে টাকার তাগিদে আসত। সোমা একদিন স্পষ্ট মুখের ওপর তাকে বলে দিয়েছে, ফের একজনও লোক এলে এ বাড়িতে আর তার জায়গা হবে না!

এ-কথা বলার মতো একটু জোর এখন সে পেয়েছে। নিজের আয় বিশেষ করে বরুণ চক্রবর্তীর চেষ্টায় অনেক তদবির তদারক করে মেয়ে-স্কুলে সামান্য মাইনের একটা চাকরি পেয়েছে সোমা। তারপর ঘরের লোককে ওই কথা বলেছে।

একদিন কি মনে হতে বরুণ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করেছে, আপনার কাছে ও এ-পর্যন্ত কত ধার নিয়েছে?

সোমার মেজাজ দেখলে বরুণ চক্রবর্তী আগের মতোই ঘাবড়ে যায়। আগের থেকে বেশি বরং। ঢোক গিলে জবাব দিয়েছে, ঠিক হিসেব করিনি—ঠেকে গেলে মাঝে মাঝে নেয়।

খুব সত্যি কথা বলেনি। যখন-তখন সে টাকা চায়। সোমা বরুণ চক্রবর্তীকেই শাসিয়ে দিল, এর পর ফের আপনি এক পয়সাও দিলে আপনার সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ফের টাকা চাইতে যেতে অরবিন্দকে বরুণ চক্রবর্তী ওই কথা বলেছে। টাকা দেবার উপায় নেই। সোমা বলে দিয়েছে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

বিরক্ত মুখ করে অরবিন্দ বলেছে, থাকবে না তো থাকবে না—

আমার বউয়ের সঙ্গে তোর সত্যি কোনো সম্পর্ক আছে নাকি! দে—দশ টাকা না দিসতো দুটো টাকা অন্তত দে।

—দেবার উপায় নেই ভাই, ও ঠিক জেনে ফেলবে।

—কি করে জানবে?

—জিজ্ঞেস করলে?

—বলবি দিসনি।

—তা হয় না, মুখের দিকে চেয়ে যখন জিজ্ঞেস করে আমার মুখ দিয়ে গলগল করে সত্যি কথা বেরিয়ে যায়।

তবু নাছোড়বান্দার মতো কিছু কিছু আদায় করে ছাড়ে অরবিন্দ।

কিন্তু আগের তুলনায় সামান্যই। আগে বেশির ভাগ সময় সোমা অথবা ছেলের খরচের কথা বলে টাকা নিত।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘোরে। সোমার সহ্যের সীমা ছাড়াতে বসেছে। বিড়ি টানে, তাস খেলে, জুয়া খেলে, আড্ডা দিয়ে কাটায়। বাড়ির সঙ্গে দুবেলা কেবল খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক। মুখোশ খুলে যেতে লোকটার সামান্য চক্ষুলজ্জার বালাইও নেই আর। এরই মধ্যে এক-এক দিন পেট-মোটা ব্যাগে বা থলেতে ওষুধ ভরতি করে নিয়ে আসে কোথা থেকে। দু-একদিনের জন্য বাইরে বেরিয়ে খালি থলে হাতে ফিরে আসে আবার। ধারে-কাছে আর সুবিধে হয় না বলেই বোধহয় দূরে যায়। কিন্তু তখন হাতে পয়সা এলেও সোমা বিশেষ কিছু ছিনিয়ে নিতে পারে না। দান-ধ্যান যা করার করেই আসে নিশ্চয়ই। কেউ কিছু চাইলে ধার করে হলেও টাকা এনে দেবার স্বভাবজাত চেষ্টা এখনো আছে। বাইরের লোক তো পছন্দ করবেই এখনো। কার ওষুধপথ্য জুটছে না, কোন্ বাড়ির রোগী মরল বা মর-মর—সবার আগে ছুটে যেতে এই অকম্মার ঢেঁকি।

কদর আছে এখনো। আবার কারো জন্য কিছু করার বাহাদুরি নিজেই জাহির করে বলে ঠাট্টা-ঠিসারাও করে অনেকে।

এরপর আবার যে ঘটনাটা ঘটল সেটাই চূড়ান্ত। সোমার বুকের তলার মমতার শেষ বিন্দুটুকুই নিঃশেষ তাইতে।

হঠাৎ একদিন দুচোখ কপালে তুলে সোমার কাছে এসে দাঁড়াল অরবিন্দ।—সর্বনাশ হয়েছে, মাসিমার মানে বীণার মায়ের গলার পাশে ক্যানসার—ডাক্তার বলেছে।

সোমা শুনল। দুঃখও যে না হল তা নয়। কিন্তু কি আর করতে পারে সে।

কিন্তু ওই লোকের তখন মাথার ঠিক নেই যেন।—কি করা যায় বলো তো, বীণাটা কেঁদে ভাসাচ্ছে, একটা চেষ্টা তো করতে হবে—বহু টাকার ফেরে পড়া গেল যে!

উচিত নয়, তবু তেতেই উঠল সোমা—টাকার ফেরে তুমি পড়তে

যাবে কেন ? তোমার টাকা আসবে কোথা থেকে ?

—তুমি বরুণকে একবার বলে দেবে ? সত্যি খুব দরকার।

—না ! আমি তাকে বারণ করে দেব।

—কি মুশকিল ! তাহলে চিকিৎসা হবে কেমন করে ? বীণাটা যে ভয়ানক কাঁদছে।

—তবে আর কি, তুমি আদর করে চোখের জল মুছিয়ে দাওগে—

—আঃ। আচ্ছা ছোটলোক তো তুমি ! লোকের এই বিপদের সময়—

—কি ? কি বললে, তুমি ?

—কি আবার বলব ? বরুণ ঠিক টাকা দিত, তোমার ভয়ে দেবে না। এতদিন বীণাকে হয়তো বিয়েও করে ফেলত—তোমার জন্যে পারছে না। তুমি ওর নাকে দড়ি পরিয়েছ—

সোমা গর্জন করে উঠল, বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে !

মাথা খারাপ করে বেরিয়েই গেল।

তারপর ঠাণ্ডা, চুপচাপ কদিন। ভিতরে ভিতরে কি প্ল্যান ভাঁজছে বোঝাই যায়। আবার থলে বোঝাই আর পেট মোটা ব্যাগ বোঝাই ওষুধ এলো কোথা থেকে। দফায় দফায় চার দিন পাঁচ দিন করে বাইরে বাইরে কাটাতে লাগল। টাকা কোথায় ঢালা হচ্ছে সোমা জানে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। তার মনে হয় টাকা আসলে খরচ করছে ওই বীণার জন্যে, তাকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে। ক্যানসার রোগী —যাবেই। তার জন্য এমন দিশেহারা ভাব কেন ?

কিন্তু ইচ্ছে করলেই যত খুশী ওষুধ আনা যায় না, যত খুশী ওষুধ বেচা যায় না। সোমার ধারণা গত দেড়টা বছরের গাফিলতির ফলে ওষুধ আনা এবং বিক্রীর ব্যাপারে আগের থেকে লোকটার ক্ষমতাও কমেছে। তা ছাড়া, মিথ্যের জাহাজ—এমন লোককে কতকাল কে চোখ বুজে বিশ্বাস করবে। কারো সঙ্গে সততা রক্ষা করে কাজ করে এমন বিশ্বাস নেই ! ফলে ওদিকে একজনের অসুখ, আর এদিকে আর

একজনের ছটফটানি লক্ষ্য করে সোমা। সাড়ম্বরে চিকিৎসা করার ইচ্ছে—সেটা হচ্ছে না বোধহয়। এ অসুখে আড়ম্বর করতে হলে টাকা অনেক লাগে বলেই ধারণা সোমার।

শিগগীরই আবার ছটফটানির অবসানও লক্ষ্য করল সোমা। ভবিতব্য মেনে নিয়ে হাল ছেড়েছে কিনা জানে না। তাছাড়া দেখাই-বা কতটুকু হয়। সকাল দুপুর বিকেল রাত্রির অনেকটা সময় তো বীণাদের বাড়িতেই কাটিয়ে আসে।

মাস ছয়েক পরে।

স্কুলের কি একটা বিশেষ ফাংশন সেদিন। অল্প বয়সী টিচাররা অন্তত বেশ সেজেগুজে যাবে। শিক্ষয়িত্রীদের এ-রকম সুযোগ খুব বেশি হয় না। ব্যাঙ্কের লকার থেকে কিছু গয়না তুলে আনবে সোমা। গায়ে যা আছে সেগুলো বদলাবে।

প্রস্তুত হয়ে ট্রাঙ্ক থেকে লকারের চাবি খুঁজতে গিয়ে চাবিটা পেল না। ভাবল ছোট জিনিস, তলায় পড়ে আছে কোথাও। কিন্তু যাবতীয় জিনিস নামানোর পরে আর শাড়িগুলোর ভাঁজ খুলে দেখার পরেও চাবি নেই। অবাক লাগছে সোমার। মাস চার-পাঁচ আগেও তো লকার থেকে গয়না বদলে এনেছিল। ফিরে এসে কোথাও রেখেছিল তাহলে চাবি?

ঘরের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। চাবি নেই।

দুশ্চিন্তায় ঘাম দেখা দিল সোমার। মাথার ঠিক থাকে না আজকাল। কোথায় রাখতে কোথায় রাখল তাহলে?

মেঝেতে পড়ে থাকলে ঝি না দেখে ঝাঁটপাট দিয়ে ফেলে দিয়েছে কিনা তাই-বা কে জানে?

দুপুরে অরবিন্দ খেতে এলে তাকে বলল, লকারের চাবিটা পাচ্ছি না।

—কোন্ লকার?

—কোন্ লকার আবার—ব্যাঙ্কের।

—ও রেখেছ কোথাও, যাবে কোথায়।

—তুমি খুঁজে দেখো না একটু। আমি তো কত খুঁজলাম।

দুজনে মিলে এক প্রস্থ খোঁজা হল আবার। কিন্তু চাবি নেই তো নেই।

—কি হবে তাহলে? সোমার কেঁদে ফেলার উপক্রম।

—কি আবার হবে, চাবি হারিয়েছে ব্যাঙ্কে জানিয়ে দিতে হবে। লকার তো আর কেউ ইচ্ছে করলেই খুলতে পারবে না।

—তুমি এক্ষুনি যাও তাহলে, রিপোর্ট করে এসো। ওরা নতুন চাবি দেবে?

অরবিন্দ বলল, সে এখন ঢের দূরের পাল্লা। এ-সব লকার বম্বে থেকে আসে। সেখানে খবর যাবে তারপর এখানে ব্যাঙ্কের লোকের সামনে লকার ভাঙা হবে—সেই বম্বে থেকে আবার নতুন চাবি তৈরি হয়ে আসবে। যাকগে, আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি, সময় লাগবে এই পর্যন্ত—উতলা হবার কিছু নেই।

তবু মন-মেজাজ একেবারে বিগড়ে আছে সোমার। পরদিনটা ছুটি ছিল স্কুলের উৎসবের দরুণ। সকালে বরুণ চক্রবর্তী এসেছিল। ইদানীং ফাঁক পেলে আসে। ছেলেটার সঙ্গে খেলা করে। সোমা মনে মনে হাসে—যেন ওই ছেলের টানেই বেশি আসছে আজকাল। কিন্তু সেদিন হাসি গেছে। বরুণ আসা মাত্র তাকে লকারের চাবি হারানোর খবরটা দিল। সেও একই আশ্বাস দিল, ঘাবড়াবার কিছু নেই, তবে ঝামেলার ব্যাপার।

কথায় কথায় এক সময় বীণার মায়ের অসুখের প্রসঙ্গ উঠল। বরুণ বলল, ওই বড় অপারেশনটা হবার পর বীণার মা তো এখন একটু ভালই আছে—সত্যি অরু যা করল নিজের ছেলেও অতটা করে না।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের তলায় কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড ঘা পড়ল সোমার। না, বীণার মায়ের বড় অপারেশনের কথা ও কিছু জানে না। কিন্তু ঘা যেটা পড়ল সেটা অন্য কিছুর।

বরুণকে বিদায় দিয়ে সোমা নিজের ঘরে এলো। তীক্ষ্ণ চোখে

চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। আধ-খোলা স্যুটকেসটা টেনে নিল প্রথম। তন্ন তন্ন করে খুঁজল। নেই। মোটা ওষুধের ব্যাগটা খুলল এবার। ওষুধ আর কাগজপত্র খুব বেশি নেই। সে-সব ঝেড়েঝুড়ে দেখল। নেই। ব্যাগের মধ্যে কয়েকটা খুপড়ি। হাত ঢোকাল একে একে। কাগজপত্র বেরিয়ে এলো। শেষে কোণের প্রায় অগোচরের একটা ছোট্ট খুপরি থেকে চামড়ার কেসে মোড়া ছোট্ট জিনিসটা বেরুল।

লকারের চাবি।

দু'চোখ ধক-ধক করে উঠল সোমার। বেলা তখন সাড়ে দশটার বেশি হবে না। সেই অবস্থাতেই রাস্তায় বেরিয়ে এসে রিক্শ নিল একটা।

ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট অফিসারকে জিজ্ঞাসা করল, ওমুক নম্বরের লকারের চাবি হারানোর কথা কেউ রিপোর্ট করে গেছে কিনা।

কেউ কিছু রিপোর্ট করেনি।

সোমা লকার খুলবে। ব্যাঙ্কের অফিসার সই করার খাতা খুলে এগিয়ে দিল।...পঁচিশ তিরিশ দিন অন্তর অন্তর চারবার লকার খোলা হয়েছে। অরবিন্দ গাঙ্গুলির চারটে সই আছে। দুজনের নামে লকার —যে-কোন একজন খুলতে পারে।

তবু সোমা লকার খুলবে। দেখবে।

অফিসার ওকে সঙ্গে করে ভোল্টে এসে তার নম্বরের লকারে মাস্টার কী ঘুরিয়ে দিয়ে চলে গেল। এবার নিজের চাবি লাগিয়ে সোমা লকার খুলল।

বাক্সগুলো সব ঠিক আছে।

ভিতরে টুকিটাকি কিছু ছাড়া বাকী চৌদ্দ ভাগ গয়নাই উধাও!

বাড়ি। সোমা অপেক্ষা করছে। তখনো পর্যন্ত বাবাকেও বলেনি কিছু।

দুপুরে খেতে এলো।

সোমা ডাকল, আগে শোনো।

স্ত্রীর এই মূর্তি দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুকে বুঝি হাতুড়ির ঘা পড়ল অরবিন্দর।

সোমা বলল, লকারের চাবি পেয়েছি।

শুকনো বিবর্ণ মুখে অরবিন্দ বলল, ইয়ে···কোথায় ছিল?

—তোমার ওই ব্যাগে।

চাবি পাওয়া পর্যন্তই খবর কিনা জানে না, তখনো প্রাণের তাগিদে যেন কিছু আশা করছে অরবিন্দ।

—ব্যাঙ্কে গেছলাম। এবার তুমি জেলে যাবার জন্যে তৈরি হও।

বজ্রাঘাত হয়েই গেল। লোকটা এর পরেও টেনে তুলতে চেষ্টা করছে নিজেকে।—জেলে যেতে হবে কেন···তোমার জিনিস তো আর নষ্ট হয়নি, ও আমি ঠিক উদ্ধার করে এনে দেব—

কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। বলতে বলতে ব্যস্ত মুখে ঘর ছেড়ে চলে এলো। তারপর রাস্তায়।

বিকেলে বরুণ চক্রবর্তী এলো।

সত্য হালদারের চিৎকার-চেঁচামেচিতে তখনো বাড়ি সরগরম। আশ-পাশের বাড়ির লোকেরাও ঘটনা জেনেছে। সত্য হালদার কিছু রেখেঢেকে চেঁচামেচি করছেন না বা হুমকি দিচ্ছেন না।

বরুণকে দেখেও চিৎকার করে উঠলেন, তোমরা এবারে থানায় যাবে কিনা, একটা কিছু বিহিত করবে কিনা?

কিন্তু এও জানেন, থানায় গিয়ে ফল কিছু হবে না। দুজনের নামে লকার। দুজনের যে-কোন একজনের জিনিস তোলার অধিকার। এটা চুরি প্রমাণ হবে কি করে?

বরুণ চক্রবর্তী সোমাকে জানালো, অরবিন্দ তার কাছে গেছল, সে সবই স্বীকার করেছে। গয়নার কিছু বন্ধক আছে আর কিছু বিক্রী হয়ে গেছে। একটা প্রাণ বাঁচানোর জন্য এই কাজ করেছে। কিন্তু জানাজানি হবার ত্রাসও মনের মধ্যে ছিল। তাই চট করে টাকাটা তুলে আনার জন্যে এক বন্ধুর সঙ্গে মাঠের রেসে গেছল। বন্ধু তাকে

জানিয়েছিল যে-যে বাজী খেলা হবে সেগুলোর মার নেই। কিন্তু সেখানেও মার খেয়েছে।

বরুণ চক্রবর্তী পকেট থেকে কিছু গয়না বার করে আমতা-আমতা করে বলল, ওর সঙ্গে গিয়ে মাত্র একটা আমি ছাড়িয়ে এনেছি।

যা ভেবেছিল তাই। সোমা রাগে কাঁপতে কাঁপতে ফুঁসে উঠল। —কেন? কেন আপনি ছাড়িয়ে আনতে গেলেন? কে আপনাকে ছাড়িয়ে আনতে বলেছিল?

গয়না কটা ফেলে রেখে বরুণ চক্রবর্তী তখনকার মত পালালো।

না, সেই থেকে অরবিন্দ গাঙ্গুলি আর এ-বাড়িতে পা দেয়নি। এখানে আর তার জায়গা হবে না এটা সে বুঝেছিল। নিজের সামান্য জিনিসপত্র লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেছে। সত্য হালদার বরুণের মারফতই তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, জোচ্চোরের সঙ্গে তাদের সমস্ত সংশ্রব শেষ হল। নাতি আর একটু বড় হলেই মেয়ের তিনি আবার বিয়ে দেবেন। যথাসময়ে ডিভোর্স স্যুটও ফাইল করা হবে।

অরবিন্দ বরুণকে বলেছে, বিয়েটা তুই-ই করে ফেল তাহলে, তবু একটু সান্ত্বনা থাকবে আমার।

বরুণ চক্রবর্তী জবাব দিয়েছে, যে মেজাজ দেখছি—কি হবে না হবে ভরসা করে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

অরবিন্দ আবার দীপেন ভট্চাযের সেই পুরনো ক্লাব ঘরেই ফিরে এসেছে। সেই বুড়ী আর তার অন্ধ ছেলে আর তার স্ত্রী আবার তাকে সাদরেই গ্রহণ করেছে। এমন মহাদেব ছেলেটাকে তার বউ চিনতে পারল না বলে বউয়েরই দোষ দিয়েছে বুড়ী।

॥ ছয় ॥

বীণা ভট্চাযের মা সেই চোখ বুজল এতকাল বাদে।

শ্মশান থেকে ফিরতে বিকেল। অরবিন্দ গাঙ্গুলি স্নান-টান সেরে

নিজের ঘরে বসেছে। মনে এখন অনেক দুশ্চিন্তা। কেউ চলে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করে তাকে। কিন্তু চলে গেলে আর শোক নিয়ে বসে থাকে না। এখন চিন্তা বীণা ভট্চাযের জন্য। মেয়েটার আর কেউ থাকল না। এও পরের ভাবনা, সমূহ চিন্তা শ্রাদ্ধশান্তির কাজ। নমো নমো করে করলেও করতে তো হবেই কিছু। বীণার সম্বল এখন দুটো গানের টিউশনি আর বাচ্চাদের গানের স্কুলের একটা মাস্টারি। সব মিলিয়ে একশ টাকা হয় কিনা মাসে সন্দেহ। তার উপর এই শেষের দিকে চোখ বুজে ধার করে গেছে মায়ের জন্য। এখন আর পাঁচটা টাকাও বার করতে পারবে না। চেয়ে-চিন্তে টাকা যোগাড় করে সৎকার করে আসতে হয়েছে।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি এখনো পেট-মোটা ব্যাগে ওষুধ ভরে বেরোয় মাঝেমধ্যে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীর ওষুধ ছেড়ে এখন চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীর ব্যবসায়ীর ওষুধে এসে ঠেকেছে সেগুলো। ধারে-কাছের কেউ আর বিশ্বাস করে ওষুধও ছাড়তে চায় না তার কাছে। ওষুধ চাইতে গেলে আগাম টাকা চায়। অথচ মন ঠিক করে বেরুলে ব্যাগে যা-ই থাক ঠিক বিক্রী করে আসতে পারে এখনো।

ভাবছে সেই চেষ্টা করবে, না দলবল নিয়ে চাঁদা তুলতে বেরুবে। এ-কাজটাও পারে। পাড়ার বারোয়াড়ী পুজো-পার্বণে চাঁদা সংগ্রহ আর উৎসবের প্রধান কর্মকর্তাও এখন সে-ই। এখনো সে সর্বদাই সকলকে বোঝাতে ছাড়ে না যে তার কদর কত। দলের অন্যান্যরা মুখ মুচকে হাসে, ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে, আবার কাজের সময় তাকেই আগে ডাকে। এত সময় আর কার হাতে আছে?

এক গেলাস চায়ের সঙ্গে মুড়ি চিবুতে চিবুতে টাকা সংগ্রহের পাঁচ রকম সম্ভাবনার কথা ভাবছিল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। টাকা কিছু সোমার থেকেও চাইতে পারে কিন্তু সে টাকা আদায় করতে হলে তাকে সেভাবে রাস্তায় পাওয়া দরকার। না বাড়িতে আর তার যাবার উপায় নেই। রাস্তায় ধরে চাঁদাটাদা আদায় করেছে অনেক সময়—কিন্তু এ তো আর দু-চার টাকার ব্যাপার নয় যে অব্যাহতি পাবার জন্যে মুখের ওপর

ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাবে। তাছাড়া বীণার মায়ের জন্যে তো এক পয়সাও দেবেই না—তার জন্যেই গয়নাগুলো গেছে।

মেঘ না চাইতে জল। বরুণ চক্রবর্তী এসেছে। টাকার তাগিদের ভয়ে আজকাল আর আসেই না বড় একটা। এই কটা বছরে মাছের ব্যবসার অনেক উন্নতি করেছে, মাস গেলে এখন কম করে হাজার দুই রোজগার করে। নিজে একটা টেম্পো কিনেছে সম্প্রতি। এর ফলে রোজগার আরো অনেক বাড়বেই জানে। কিন্তু ওর কাছ থেকে টাকা আদায় করা ক্রমে শক্ত হয়ে পড়ছে। সোমা ওকে এ ব্যাপারে এমন শাসানির মধ্যে রেখেছে যে ইচ্ছে থাকলেও দিতে পারে না।

তবু ওকে দেখামাত্র ভিতরে ভিতরে মরিয়া হয়ে উঠল অরবিন্দ গাঙ্গুলি।

—আয়, আমার মাছ ভাজা কই ?

বরুণ চৌকির একপাশে বসে বলল, চেয়েছিলাম—কাঁচা তুলে নিয়ে যেতে বলল।

—তাই তুলে নিয়ে এলি না কেন দু-চারখানা। আমার জন্য আদর করে ভেজে পাঠাবে না জানা কথাই তো।...তা তুই হঠাৎ যে ?

—বীণার মা-টা মারা গেল, একবার দেখা করতে যাওয়া উচিত কিনা ভাবছিলাম...।

অরবিন্দ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।—নিশ্চয় উচিত। চল আমি নিয়ে যাচ্ছি। মেয়েটার সে-কান্না যদি দেখতিস। আমাকে বলে, অরুদা তুমি ছাড়া আমার আর কে থাকল ? আমি বললাম, কেন বরুণও আছে, তোর এত ভাবনা কি ? এই চা-মুড়িটা খেয়েই তোকে নিয়ে যাচ্ছি চল—

বরুণ জিজ্ঞাসা করল, বীণাটা এখন অনেক বদলেছে না রে ?

—শুধু বদলেছে, একেবারে নিরেমিষ স্ক্রোর মতো হয়ে গেছে। তোর কথা তো প্রায়ই জিজ্ঞেস করে...তুই যে আবার আমার বউটাকে নিয়ে আটকে গেলি নইলে এতদিনে ওকে তোর ঘর করতে পাঠিয়ে দিতাম—কি সুন্দর যে গান করে এখন শুনলে তোর কান জুড়িয়ে

যেত। কি যে হবে এখন ভগবান জানে—

চিন্তিত মুখে বরুণ বলল, অনেককাল আগে ওর গান শুনেছিলাম, তখনো ভাল লাগত।···এক কাজ কর, তুই-ই ওকে বিয়েটা করে ফেল। ডিভোর্স তো একরকম হয়েই আছে তোদের, কোর্টে গিয়ে দাঁড়ালেই হল।

টাকার মুখ দেখার পর থেকে বন্ধু এখন বিয়ের ভাবনা ভাবছে খুব অরবিন্দ এটা জানে। এমন কি সোমাকে নিয়েই খোলাখুলি আলোচনা হয় দুজনের। কিন্তু ওই মেয়ের ব্যাপারে আজও ওর টান যত ভয়ও ততো।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, তোর যেমন বুদ্ধি—বীণা নিজের দাদা বলেই ভাবে আমাকে—তাছাড়া আমার একটা বিয়ের ফল তো দেখলি, সব মেয়েই গলায় দড়ি দিতে চাইবে।

বরুণ সেটা অস্বীকার করতে পারল না। বলল, কিছু ভাল লাগছিল না, একবার তাই এলাম তোর কাছে···বীণার বাড়িতে যাওয়া-টাওয়া এখন হবে না—সোমা জানতে পারলে কেলেংকারী হয়ে যাবে।

অরবিন্দ মনে মনে একটা গালাগাল দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, জানতে পারছে কি করে?

—ও মুখের দিকে তাকালেই কেমন করে বুঝে নেয়। আজ তুই আমার খোঁজ করেছিলি জেনেই শাসিয়ে রেখেছে এক পয়সাও যাতে না দিই—

—না দিলে ওর মায়ের কাজ হবে কি করে? হাজার হোক ও-ও তো তোর আপনার জন হতে পারত। শতখানেক টাকা তোকে দিতেই হবে।

—ও বা-বা! বরুণ আঁতকে উঠল। শ'খানেক পয়সাও আমি দিতে পারব না ভাই—আজ রাতেই সোমার ওখানে আমার খেতে যাবার কথা—ধরা পড়লে খাওয়া বার করে দেবে।

অরবিন্দ থমকে চেয়ে রইল মুখের দিকে খানিক।—এত যে ভয়

করিস বিয়ে করার পর সামলাবি কি করে?

বরুণ চক্রবর্তী সমস্যাটা স্বীকার করেই নিল যেন। বলল, সত্যি এক একসময় এত ভয় করে মুখের দিকে তাকানো যায় না পর্যন্ত— বীণাটাকে সে তুলনায় আজকাল আর একটুও ভয় করে না—মাঝে মধ্যে রাস্তায় দেখা হয় তো—ও হেসেই কথা বলে।···কিন্তু তোর বউটা হাসতেই ভুলে গেছে যেন···তবু মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন মিষ্টি লাগে বুঝলি—এই আজই তো সকালে—

থেমে গেল। অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, আজই সকালে কি?

—না না না—কিছু না। আমি চলি ভাই—

যেন ধরা পড়ে পালাবার তাগিদ। অরবিন্দর অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, টাকার সুরাহা হবার আশা দেখছে না।—তুই তাহলে বীণার জন্য একটু শুকনো সহানুভূতিই দেখাতে এসেছিলি?

আবার মনে পড়ল কি! দুর্বলতার কিছুই যেন। দ্বিধান্বিত সুরে বলল, সেই জন্যও এসেছিলাম আর একটু অন্য কাজেও এসেছিলাম—

—কি?

—একটু বেরুবার সময় হবে তোর?

—হবে। কোথায়?

—ইয়ে, সোমার মনে মনে একটা ঘড়ির শখ আছে, হাতে টাকা এলে একটা কিনবে বলছিল।···ইচ্ছে করছে একটা ঘড়ি কিনে আজ ওকে প্রেজেন্ট করি। কি-রকম ঘড়ি ওর পছন্দ হতে পারে আর কিভাবে প্রেজেন্টটা করব ঠিক করতে না পেরে তোর কাছে এসেছিলাম।

শোনার পর অরবিন্দ গম্ভীর একটু।—আমি তোকে এমন ঘড়ি কিনে দিতে পারি যা দেখলে তোর দাম ওর কাছে চার গুণ বেড়ে যাবে। ওর পছন্দ-অপছন্দের নাড়ি-নক্ষত্র জানা আছে আমার।

বরুণ সাগ্রহে বলল, তাহলে চল না ভাই আমার সঙ্গে একটু।

—তাহলে আজ সকালে কি হয়েছিল বল! আজই-বা তোর এত ঘড়ি দেবার ইচ্ছে হল কেন?

—ইয়ে, না না সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার।

—এই যে বললি মিষ্টি? খুলে বল না, তোর তাতে সুবিধে ছাড়া অসুবিধে হবে না—ওর রাগের দিক যেমন জানা আছে মিষ্টি দিকটাও তেমনি জানা আছে আমার—বুঝলি? বল বল—এসব কথা বন্ধুকেই বলতে হয়।

মুখ লাল করে বরুণ বলল, আমি ভাই ইচ্ছে করে দেখিনি। ওর বাবার তাগিদে চায়ের কথা বলতে এসে হঠাৎ দেখে ফেলেছি। তারপর থেকে আর ভুলতে পারছি না তাই—

অরবিন্দ থমকে তাকালো মুখের দিকে।—কি দেখে ফেলেছিস—ভিজে কাপড়ে চান-টান করা অবস্থায়?

—না-না—ইয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিল—

—ও। আর একটু সোজা হয়ে বসে মুখের দিকে তাকালো অরবিন্দ।—গায়ে জামা-টামা ছিল না?

—তুই বড় বিচ্ছিরিভাবে জিজ্ঞেস করিস। জামা থাকবে না কেন? তবু···

—ঠিক আছে, বোস্। উঠে গম্ভীর মুখে নিজের বাকস খুলতে গেল। ঘাঁটাঘাঁটি করে কি বার করতে দেখা গেল হাতে ছোট অ্যালবাম একটা। বরুণের সামনেই বসল আবার। ভিতর থেকে ছবি টেনে বার করল একটা। নিজে একটু দেখে নিয়ে ফটোটা ওর সামনে ধরল।—ঠিক এ-রকমটা নয় তাহলে?

আদুড় গায়ে সেই মাথা আঁচড়ানোর ফটোগুলোর একটা। সেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বরুণ চক্রবর্তীর বসন্তের দাগ মারা মুখে এক ঝলক তাজা রক্ত উঠে এলো যেন। ভালো করে তাকাতেও পারছে না, আবার না তাকিয়েও পারছে না।

অরবিন্দ আর একখানা ফটো এগিয়ে দিল তার দিকে।—এটাও দেখ্।

সেই একই ছবি। কিন্তু অন্য ঢং-এ তোলা। কান-মাথা গরম হয়ে উঠছে বরুণ চক্রবর্তীর।

ছবি দুটো তার হাত থেকে নিয়ে অরবিন্দ গাঙ্গুলি চুপচাপ ভাবল একটু।—আমাকে বলে তোর লাভ হল না লোকসান হল?

—লা-লাভই হল।

—এক গেলাস জল খাবি?

—হ্যাঁ ভাই—বড় তেষ্টা পেয়েছে।

উঠে এক গেলাস জল গড়িয়ে তার হাতে দিল। বরুণ তখন বিস্ফারিত নেত্রে ফটোর খামটার দিকে চেয়ে আছে। আর একবার দেখার ইচ্ছে, কিন্তু সাহস নেই।

—নে ধর।

জল খেল। তার সামনে বসে অরবিন্দ গাঙ্গুলি বেশ চিন্তাচ্ছন্ন। বলল, একটা সমস্যার কথা ভাবছি···সোমার কাছে আমি এখন পর-পুরুষ। দুদিন আগে হোক পরে হোক ডিভোর্স তো হয়েই যাচ্ছে ···এ-ছবি এখন আর আমার কাছে থাকা উচিত?

চোখে-মুখে একটা অস্বাভাবিক আগ্রহ ফুটে উঠল বরুণ চক্রবর্তীর। জোরে মাথা ঝাঁকালো।—থাকা উচিত নয়।

—বরং তোর কাছেই এখন এ দুটো থাকলে দোষ নেই—আমার থেকে তোর বেশি অধিকার।

বরুণ আবার মাথা নেড়ে সায় দিল। অর্থাৎ তাই!

খাম থেকে ফটো দুটো আর একবার বার করল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। বন্ধুর দিকে একটু তেরছা করে ধরে শেষবারের মতোই দেখে নিল যেন। বলল, এ দুটো হাতছাড়া করতে আমার পাঁজর ভাঙছে—

—তুই প-পরপুরুষই ভাব না নিজেকে।

—চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, এ দুটো রাখ তোর কাছে। দু'শ টাকা দে—

দু' চোখ কপালে তুলে ফেলল বরুণ চক্রবর্তী।—দুটো ছবির দাম দু'শ টাকা!

—হ্যাঁ। তার এক পয়সাও কম নয়। আমার যন্ত্রণাটা বুঝছিস?

—ইয়ে, তা বলে দু'শ টাকা!

মুখ ঈষৎ বিকৃত করে অরবিন্দ গাঙ্গুলি বলল, ছবির দামটাই সব নাকি—মাত্র দু'শ টাকার জন্যে পরপুরুষের হাত থেকে আপনার জনের এ ছবি ছিনিয়ে যদি নিতে না পারিস তো ভাগ—ঘড়ি-টড়িও নিজেই কেন গে যা।

বরুণ চক্রবর্তী থমকে বসে রইল খানিক। আবারও জল তেষ্টা পাচ্ছে।—ইয়ে···সোমা জানতে পারবে না?

—এসব জানতে পারার ব্যাপার নাকি? তুই নিশ্চিন্ত থাক—

পকেট থেকে দুখানা একশ টাকার নোট বার করে বরুণ তার হাতে দিল।—দেখিস ভাই।

নোট পকেটে পুরতে পুরতে অরবিন্দ আবার আশ্বাস দিল, তুই হলি গিয়ে প্রাণের বন্ধু। তোকে দেখব না তো কাকে দেখব। নে ছবি নে—

ছবির খামটা বুক পকেটে রাখার ফলেই বরুণের ঘেমে ওঠার দাখিল।

ঘড়ি কেনা হল। সুন্দর লেডিজ রিস্টওয়াচ। এখন বরুণের সমস্যা সোমাকে এটা দেবে কি করে।

অরবিন্দ বলল, খপ করে হাতখানা ধরবি, পরিয়ে দিবি—আবার কি? সবে তো শুরু, আরো কত জিনিসের শখ ছিল সোমার—একটা গ্যাস প্ল্যাণ্ট, সুন্দর একটা বাথরুম—

"বাথরুম! বরুণ হাঁ। তারপর বলল, ও-সব না হয় বিয়ের পর আস্তে আস্তে হবে—

অরবিন্দ একটু ভেবে বলল, বাথরুমটা না হয় পরেই হবে, গ্যাসটা ইচ্ছে করলে আগেই দিতে পারিস—আরে বাবা, এসব আমি দিতে পারলুম না বলেই তো ছাড়াছাড়ি। পারলে কি কথা ছিল!

বরুণ চক্রবর্তী চিন্তাচ্ছন্ন আবার।

সন্ধ্যার পর স্নান-টান করে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তার আগে বার দশেক সোমার ওই ছবি দুটো দেখেছে। একলা ঘরেও

দেখতে ভয় তার।

এ-বাড়িতে আসার কয়েক মিনিটের মধ্যে সোমা তাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, আপনার শরীর খারাপ নাকি ?

—না-না-তো···কেন ?

—মুখ লাল-লাল দেখছি।

বরুণ কেন যেন ভালো করে তাকাতে পারছে না সোমার দিকে। সানুকে কাছে টেনে নিয়ে তার দিকেই মনোযোগ দিল একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করল, মাছটা কেমন ছিল ?

- খুব ভালো। কয়েকটা ভেজে রেখেছি, যাবার সময় নিয়ে যাবেন। পরক্ষণে নিজের ওপরেই যেন বিরক্ত সোমা। বলল, মাসি মারা গেছে বলে নমিতাদির কাছ থেকে পর্যন্ত দশটা টাকা নিয়েছে —বুঝলেন ? আমি রাগ করে সে-টাকা দিয়ে দিয়েছি।

এই ক্রুদ্ধ মুখ দেখলেই বরুণ চক্রবর্তী ভড়কে যায়। বলল, খুব অন্যায়।

না ঘড়ির কথা উত্থাপন করার মতো সাহস সংগ্রহ করতে পারছে না। অরবিন্দ খপ করে হাত টেনে নিয়ে ঘড়ি পরিয়ে দিতে বলেছিল। ওর ওই হাতের দিকে বারবার তাকানোই সার। শেষে খাওয়া-দাওয়া চুকতে মরিয়া হয়েই বলে ফেলল, একটা কথা ছিল—

সোমা ঘুমন্ত ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছিল। গলার স্বর অন্যরকম লাগতে ঘুরে তাকালো। মুখ দেখে আরো অন্যরকম লাগল। গম্ভীর একটু। ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।—বলুন।

—মা-মানে একটা জিনিস এনেছিলাম।

সোমা এবার যথার্থ অবাক।—কি জিনিস ?

পকেট থেকে ভয়ে ভয়ে ঘড়ির কেসটা বার করল বরুণ। সোমা আবারও অবাক। খপ্ করে সে-ই তার হাত থেকে কেসটা নিয়ে খুলে দেখল।—বাঃ সুন্দর ঘড়ি তো! আমার জন্য নাকি ?

বরুণের গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। মাথা নাড়ল। তাই।

কি কাণ্ড! এ-তো দামী ঘড়ি বেশ! কত দাম পড়ল ?

ছু'শ পঁচাত্তর।

—দেখে তো খুশী হয়েছে স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু গলায় অনুযোগের সুর। আমার জন্যে হঠাৎ ঘড়ি আনতে গেলেন কেন?

বরুণ চক্রবর্তীর মুখখানা খুশীতে ভরাট। বলে ফেলল, অনেক দিন ইচ্ছে করছিল কিনে আনি···সাহস পাচ্ছিলাম না।

সোমার ছু'চোখ তার মুখের ওপর থমকালো একদফা। আজ সাহস পেলেন কি করে?

বরুণ জবাব হাতড়ে পেল না। আজকের দিনটা এই লোকের কাছে কি কারণে ব্যতিক্রম সোমার মনে পড়ল। সকালের মাথা আঁচড়ানোর সেই ঘটনাটা আর একটা তিক্ত স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। চোখে কৌতুকের ছায়া তবু একটু।

সাহস পেয়ে বরুণ এবার মনের বাসনা ব্যক্ত করেই ফেলল।— ঘড়িটা একটু পরিয়ে দিয়ে দেখব ঠিক হল কিনা?

কৌতুকের ছায়া ঠোঁটের ফাঁকেও স্পষ্ট হল এবার। ভাবছিল বলে, এ কি চুড়ি বালা আংটি যে পরিয়ে দেখতে হবে! বলল না। ঘড়িসুদ্ধ হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দিন—।

···হ্যাঁ আজ ভোর রাতে ওই স্বপ্নটা দেখার পর থেকেই মন সে অনেকখানি স্থির করে ফেলেছে। না বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে কোন-রকম আনন্দ-কল্পনার জোয়ারে ভাসেনি। একটা রূঢ় কাজ সম্পন্ন করে ফেলার কথাই ভেবেছে। যত শিগ্গীর সম্ভব এবার ডিভোর্সটা চুকিয়েই ফেলবে। ও-রকম আজে-বাজে স্বপ্ন দেখার কোন মানে হয় না, সত্যিই মাথা গরম হলে কখন কি করে বসে ও ঠিক কি। ডিভোর্স হলে যে লোকটার এগিয়ে আসার সম্ভাবনা সে আজকের দিনেই পা বাড়াবে এটা ভাবেনি। খারাপ লাগছে না।

ঘড়ি পরাতে গিয়ে গলদঘর্ম অবস্থা বরুণের। সোমার এত কাছা-কাছি আর কখনো আসেনি। তার ওপর ওর উষ্ণ নরম বাঁ হাতটা তার ছুই হাতে। নিজের হাত ছুটো কাঁপছে বরুণ নিজেই টের

পাচ্ছে। সোমার কৌতুক মাখা দু'চোখ তার মুখের ওপর। গম্ভীর কৌতুকে ও যেন একটা মজা দেখছে।

ঘড়ি পরানো শেষ হতে ঢোক গিলে বরুণ বলল, বেশ হয়েছে।

সোমা হেসে ফেলল।

কার মুখ দেখে আজ ঘুম থেকে উঠেছিল বরুণ চক্রবর্তী কে জানে। আনন্দ ধরে না। কিন্তু তা প্রকাশের ভাষা নেই। বলে ফেলল, এরপর গ্যাসও শিগ্‌গীরই আনছি, তারপর বাথরুমটা আস্তে আস্তে হবে—

সোমা হাঁ হয়ে তাকালো এবার।—বাথরুম!

—ইয়ে···ও দুটোরও শখ তোমার···

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় সোমা স্তব্ধ খানিক। চাউনিটা লোকটার মুখের ওপর স্থির হয়ে এঁটে বসেছে।

—আপনার সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল?

—কার সঙ্গে?

সোমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, কার সঙ্গে বুঝতে পারছেন না?

বরুণ চক্রবর্তী খাবি খেল বার কয়েক।—হয়েছিল···

সোমার ইচ্ছে করল ঘড়িটা হাত থেকে খুলে মুখের ওপর ছুঁড়ে মারে। অস্বাভাবিক গম্ভীর। বলল, আপনি আর কিছু আনবেন না বা এক পয়সাও খরচ করবেন না।

ধড়ে প্রাণ এলো বরুণ চক্রবর্তীর। আচ্ছা আচ্ছা,—আর ওই ওর সঙ্গেও কোন সম্পর্ক রাখব না—মাছ ভাজা কখানা পৌঁছে দিয়েই চলে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে আরক্ত মুখে সোমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। ব্যাপার সঠিক না বুঝে বরুণও পিছনে এলো। হয়তো মাছ ভাজা দেবার জন্যই রান্নাঘরে ঢুকেছে ভাবল।

রেকাবির ভাজা মাছ কটা এনে সোমা উঠোনের ও-ধারের নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। সরোষে বলে উঠল, মাছ ভাজা খেতে হলে এসে ওখান থেকে খেয়ে যায় যেন!

হন হন করে আবার নিজের ঘরে ঢুকে গেল সোমা।

বিমূঢ়-মূর্তি বরুণ চক্রবর্তী বাইরের দিকে পা বাড়াল।

চারদিন পরে। ছেলেকে তার স্কুলে ছেড়ে দিয়ে সোমা নিজের স্কুলের দিকে চলেছে। লোকটা সোজা এসে মুখের সামনে পথ আগলে দাঁড়াল।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি।

মুখের দিকে চেয়েই সোমা বুঝে নিল এটা হঠাৎ দেখা নয়। সুযোগ মতো অপেক্ষা করছিল। এখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠোটের ফাঁকে অল্প অল্প হাসি ঝরছে।

এই লোককে সামনে দেখলেই সমস্ত স্থৈর্য একসঙ্গে হারাবার উপক্রম হয় সোমার। অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো।

অরবিন্দ বলল, ঘড়িটা চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে, কার পছন্দ দেখতে হবে তো···

সোমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমার স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে!

—একদিন একটু দেরি হলে কি আর।···শোনো, সামনের বৃহস্পতিবার বীণার মায়ের কাজ। মেয়েটা তোমার কাছে যেতে সাহসই করছে না। আমাকে নেমন্তন্ন করার জন্যে ধরেছে।··· বরুণের দেওয়া ওই দুশটি টাকায় নমো-নমো করে কাজ হচ্ছে··· অত করে বলছে মেয়েটা, সম্ভব হলে যেও একবার।

স্থান-কাল ভুল হবার দাখিল সোমার। ফুঁসে উঠল।—মিথ্যে কথা! বরুণবাবু দুশ টাকা দিয়েছেন?

মোলায়েম করে অরবিন্দ বলল, দিয়েছে বলেই তো সবদিক রক্ষা হল।···অবশ্য ওই দুশ টাকার বদলে দিতেও হয়েছে কিছু।

শোনার প্রতীক্ষায় সোমা তেমনি জ্বলন্ত নেত্রে চেয়ে আছে।

নিস্পৃহ মুখে অরবিন্দ বলল, সেদিন সকালে আয়নার সামনে তোমাকে মাথা আঁচড়াতে দেখার পর থেকে বেচারা ছটফট করছিল। ···তাই আমার তোলা তোমার সেই মাথা আঁচড়ানোর ছুটো ছবি দুশ টাকায় দিয়ে দিলাম তাকে। বরুণও স্বীকার করল আমার মতো

পরপুরুষের কাছে ও ছবি আর থাকা উচিত নয়।

সোমার পায়ের তলার মাটি সবেগে দুলে উঠল বুঝি। সমস্ত মুখ টকটকে লাল। এই মানুষকে ধরে এক্ষুনি পথের ওপর যদি কেউ খুন করে ফেলে তাহলেও রাগ যায় না।

সোমা স্কুলে এসেছে। কিন্তু একটা ক্লাসও ভালোমতো নিতে পারেনি।

ভোর রাতের স্বপ্নটা বারবার মনে পড়েছে। হ্যা, ঠিক ওইভাবেই মানুষটার সমস্ত দেহ মাটিব সঙ্গে থেঁতলে দিতে ইচ্ছে করেছে তার।

সেইসঙ্গে আর একজনের ওপরেও চূড়ান্ত আঘাত হানার ইচ্ছে। বরুণ চক্রবর্তীর ওপর। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার পর মনে হল যা শুনল তার সব সত্যি নাও হতে পারে। যে বলেছে সে শতকরা একশটাই মিথ্যে বলে। সত্যি কি মিথ্যে সেটাই আগে জানা দরকার সোমার। ওই ছবি হাতে পড়ার সম্ভাবনার কথা ভাবতে গিয়েও সমস্ত মুখ আবার টকটকে লাল।

বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে বিভোর হয়ে চবি দেখছিল বরুণ চক্রবর্তী। ঘরে অপ্রত্যাশিত রমণীর পদার্পণে আঁতকে উঠে বসল একেবারে। মুখের দিকে রক্ত ছুটেছে একরাশ। হাতের বস্তু তাড়াতাড়ি বালিশের নিচে চাপা দিয়ে রমণীর মুখোমুখি হল।

এসেছে বীণা ভট্চায। পরনে লাল পেড়ে কোরা শাড়ি। তেলবিহীন লালচে চুল পিঠে চড়ানো। বিষণ্ণ কিন্তু কমনীয়।

হাসতে চেষ্টা করে বলল, ভয়ানক চমকে উঠলেন দেখি···আর তো কেউ নেই, নিজে না এসে কি করি বলুন···।

—বে-বেশ করেছ। ক্যা-ক্যানো বলো তো ?

—কেন আর কি। গরিব হলে কৃতজ্ঞতাটুকুও থাকতে নেই ভাবেন বুঝি। আপনার দয়াতেই তো দায় উদ্ধার হতে পারছি। অরুদা বলল, আমার বিপদের কথা শুনে আপনিও কেঁদেই ফেলেছিলেন··· তারপর টাকা তো দিয়েইছেন···

—আমি কেঁদেছি ! টাকা দিয়েছি ! অরু বলল ?

—আপনি আমাকে জানতে দিতে চাননি বুঝতে পারছি···আপনি অনেক বড়, নইলে আমার মতো মেয়ের তো মুখ দেখারও কথা নয় আপনার—

বরুণ চক্রবর্তী ফাঁপরে পড়ল যেন। বলল, মুখ না দেখার কি আছে ! তুমিই তো গণ্ডগোল করে ফেলেছিলে নইলে এতদিনে তো··· যাকগে, কবে কাজ ? মেয়েদের তো তিনদিনে হয় শুনেছিলাম—

গণ্ডগোল না হলে এতদিনে কি হত বলতে গেছল বুঝে বীণার মুখ সামান্য লাল হয়ে উঠল। পরের প্রশ্নে হেসেই ফেলল। বলল, আমার কি বিয়ে হয়ে গেছে যে তিনদিনে কাজ সারব—এগারো দিনেই কাজ—আপনি একবার গিয়ে দাঁড়াবেন।

—আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে—কিন্তু ইয়ে—আমার এই টাকা-কাক। দেবার কথা কারো কাছে যেন গল্প কোরো না। অরুটা একটা যাচ্ছেতাই—

মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বীণা বলল, অশৌচ না থাকলে আপনাকে একটা প্রণাম করে যেতাম। চলি—

চলে গেল।

বরুণ চক্রবর্তী বিমনা হয়ে রইল খানিক···অরু বলেছিল মেয়েটা অনেক বদলেছে। বরুণের মনে হল আগের তুলনায় সত্যি ঢের বদলেছে।

পরক্ষণে কি মনে পড়তে সাগ্রহে বালিশের তলা থেকে সেই ছবি দুটো বার করল আবার। বালিশের ওপরেই পাশাপাশি সাজালো সে দুটো। তারপর বুকে উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থায় সেই ছবি দেখতে দেখতে স্থান-কাল ভুল হয়ে গেল আবার।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না।

হঠাৎ একটা বড় রকমের ভূমিকম্পই শুরু হয়ে গেল বুঝি। চোখের সামনে ঘর চৌকি মাটি যেন বনবন করে ঘুরে গেল একপ্রস্থ। না ঠিকই দেখছে তারপর। যার হাতের একটা ঝাপটায় বালিশের ওপর

থেকে ছবি দুটো ছিটকে মাটিতে পড়েছে—সে-ই সামনে দাঁড়িয়ে দু' চোখের আগুনে ভস্ম করছে তাকে।

সোমা।

জ্বলন্ত চোখ দুটো তার দিক থেকে সরে মেঝের ছবি দুটোর ওপর গিয়ে পড়ল আবার। দ্রুত সে-দুটো মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে একসঙ্গে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতে গিয়ে ফেলল না। এত রাগ সত্ত্বেও ওগুলো বাইরে ফেলার নিবুদ্ধিতা থেকে নিজেকে রক্ষা করল। হাতের মুঠোয় সেগুলো রেখেই চোখের আগুনে ওই লোকের মুখটা পোড়াতে চেষ্টা করল আবার।—অসভ্য ইতর কোথাকারের, লজ্জা করে না আপনার?

মাথাটা ঘুরছে এখনো বরুণ চক্রবর্তীর।—না, মানে সোমা, আমার কথা শোনো—

—কিচ্ছু শুনব না, কিচ্ছু শুনতে চাই না—একজনের সঙ্গে মিশে আপনিও একটা জানোয়ার হয়ে গেছেন। আপনাদের মুখ দেখতে ঘেন্না করে। অনেক টাকা হয়েছে আপনার—না? এক কথায় দুশ চারশ হাজার দু হাজার বের করে দিলেই হল—কেমন? লজ্জাও করে না?

একটা ঝড়ের মতোই বেগে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

প্রাণের দায়েই বরুণ এসে উপস্থিত অরবিন্দর কাছে। কিন্তু প্রথম দর্শনে চটেই গেছে সে। বলল, তুই আমার এভাবে সর্বনাশ করলি—অ্যাঁ?

অরবিন্দ পাল্টা জবাব দিল, মেয়েছেলের মতো করিস না, কি হয়েছে খুলে বল—।

কাঁদো কাঁদো মুখে দুঃসমাচার জানালো বরুণ। শুনে অরবিন্দ আরো গম্ভীর।—তার জন্য এত উতলা হবার কি আছে—

—উতলা হবার কি আছে! তুইই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস নিশ্চয়!

—আমি আবার কি করলাম! ও ছবি তো সে নিজের চোখেই

তোর বালিশের ওপর দেখেছে বলছিস—হাতে-নাতে পেয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করেছে—

—হ্যাঁ। কিন্তু সোমা হঠাৎ আমার ঘরে গিয়ে হাজির হল কেন? কিছু একটা খবর নিশ্চয় পেয়েছে—

একটু ভেবে অরবিন্দ বলল, বীণাদের টাকা দেবার খবর পেয়েই হয়তো গেছল—গিয়ে দেখে এই কীর্তি তোর।

বাগতস্বরে বরুণ বলল, আমি টাকা দিয়েছি এ-কথা বীণাকে কেন বলতে গেলি তুই—তার মুখ থেকেই নিশ্চয় পাঁচ কান হয়েছে—আমার নাম করে কেন এই মিথ্যে বলবি তুই?

অরবিন্দ খেঁকিয়ে উঠল, তবে কি আমার বউয়ের বুক-খোলা ছবির জন্য দুশ টাকা দিয়েছিস এই কথা বলব? দিনকে দিন একটা ইডিয়েট হচ্ছিস তুই।

অসহায় স্বরে বরুণ বলল, কি লজ্জা, আমার এখন মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

একটু ভেবে অরবিন্দ বলল, মরতে হবে না, ভালোই হয়েছে বোধহয়।

উদ্‌গ্রীব আশা নিয়ে বরুণ তাকালো তার দিকে।

—ওই সব দুর্বল ব্যাপার-ট্যাপারগুলো ধরা পড়ে গেলেই মেয়েরা উল্টে মনে মনে পছন্দ করছে থাকে। ওই ছবির মতো অবস্থায় আমি দেখে ফেলেছিলাম বলেই তো বিয়েটা হল আমারই সঙ্গে।

বরুণ চক্রবর্তী দুর্বোধ্য বিস্ময়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

পরের ছ'মাসে মাছের ব্যবসায় বরুণ চক্রবর্তীর রোজগার আরো বেড়েছে। টেম্পো কেনার ফলে মাসে কম করে তিন সাড়ে তিন হাজার টাকা করে থাকে তার। কিন্তু ভিতরটা বিষণ্ণ সর্বদা। মনেও এতটুকু শান্তি নেই। বিয়ের ব্যাপারে এবারে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু সোমার দিক থেকে কোনরকম সাড়া নেই। সেই ঘটনার পর থেকে ওর প্রতিও নিঃস্পৃহ, অকরুণ।

অথচ দেখা হলেই সত্য হালদার তাগিদ দিচ্ছেন, বুঝিয়ে-শুনিয়ে ডিভোর্সটা তো করে রাখো, কখন কি ফ্যাসাদ এসে উপস্থিত হবে ঠিক আছে !

কিন্তু বরুণ চক্রবর্তী বোঝাবে কাকে। সোমার সামনে দাঁড়ালেই তো ভিতরটা কি-রকম ঠাণ্ডা মেরে যায় তার। তেষ্টা পায়। এর থেকে বীণার সামনে বরং অনেক সহজ আর স্বাভাবিক বোধ করে। অরবিন্দ আজকাল একটা কিছু অজুহাতে মাঝে মাঝে ওকে বীণার ওখানে ধরে নিয়ে যায়। মেয়েটা একলা থাকে এমনিতে যেতে ইচ্ছে করে। বাইরে দাঁড়িয়ে সেদিন কি সুন্দর গানখানা না শুনল। আমার গানের কলি বকুল হয়ে ফুটবে যেদিন—। আর মনে নেই। অরুটার জন্য পুরো গানটা শোনা হল না, হুড়বড় করে ভিতরে ঢুকে গেল। না, বীণার কাছেও যেতে ভয়, তার কথা বেশি ভাবতে ভয়। ভয় সোমার জন্য। ওখানেই বিয়েটা ভবিতব্য ধরে নিয়েছে, আর সত্যি কথা বলতে কি, সোমার সঙ্গে বীণার তুলনা হয় না। সেই ছবি দুটো কুটিপাটি করে ছিঁড়ে ফেলা হলেও বরুণের মন থেকে তো আর কেড়ে নিতে পারেনি। মনে পড়লে এখনো স্পষ্ট দেখতে পায়, আর কানের ডগা দুটো গরম হয়ে ওঠে।

সান্ত্বনা বা আশ্বাসের আশায় বরুণ প্রায়ই অরবিন্দর কাছে আসে। আসে যখন তার ব্যাগে দু পাঁচ-টাকার বেশি থাকে না। কারণ যতো বেশি থাকবে ততো বেশি খসার সম্ভাবনা। এর মধ্যে অরু একদিন খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা তোর বীণাকে বেশি ভালো লাগে না সোমাকে ?

বরুণ ভেবে-চিন্তে জবাব দিয়েছে, দুজনকে দুরকমের ভালো লাগে।

—ধর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দুজনকেই যদি তোর সামনে ছেড়ে দেওয়া হয়, তুই কাকে নিবি ?

—সোমাকেই।

—তাহলে ওকে এত ভয় করিস কেন ?

—ভয়ের মধ্যেও ওকেই বেশি ভালো লাগে। তাছাড়া, অন্য

মেয়ের কথা আমার তো আর ভাবাও উচিত নয়—কি বল ?

…অরবিন্দ হঠাৎ যে-চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিল বরুণের কেমন যেন ভয়ই ধরে গেছল। আজকাল আবার গাঁজা খায় মাঝে মাঝে, চোখ লাল থাকে।

সেদিন বরুণ এসে খবর দিল, ছেলেটাকে সত্যি নরেন্দ্রপুরে পাঠিয়ে দিলে—

অরবিন্দ সচকিত।—কার ছেলেটাকে ?

—কার আবার, তোর ছেলেটাকে।

—কেন, কেন ?

বরুণ যেমন শুনে আসছে তেমনি বলল।—এখানে থাকলে মানুষ হবে না, তোর মতো হয়ে উঠবে শেষে। ওর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সোমার চোখে ঘুম নেই। আজ আমার সঙ্গে গিয়েই রেখে এলো। সেখানে হস্টেলে থেকে পড়বে।

সেদিন অন্য কোনো কথাই জমল না আর। অরবিন্দ থেকে থেকে বিমনা হয়ে পড়তে লাগল। বরুণ বলল, সোমা কি-যে ভাবে বুঝি না! বিয়ের পর ছেলেটাকে কি আমি দেখব না।

—সোমাকে বলেছিলি সে-কথা ?

—এ আর বলার কি আছে, জানা কথাই তো। তাছাড়া সোমাকে কটা কথাই-বা বলা যায়।

অরবিন্দ কি ভাবছে সে-ই জানে। জিজ্ঞাসা করল, রেখে এলি যে, ছেলেটা কান্নাকাটি করল না ?

—খুব। সোমা শেষে ধমকে থামালো। আমার মন খারাপ দেখে আমাকে সুদ্ধু বকুনি।—আপনারা কি চান বাপের মতো হয়ে ওইরকম হা-হা করে ঘুরে বেড়াক ?

না, কথাবার্তা আর হলই না সেদিন। অরবিন্দ কেমন একটা ছটফটানি ভাব নিয়ে উঠে গেল।

সত্যি কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল অরবিন্দ গাঙ্গুলির। বাবা-মায়ের অভাবে সেই অনিশ্চিত ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল।

বাইরে দাপট দেখিয়ে তখন হা-হা করে বেড়াতো বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে হাহাকার করত। জগৎটাকে বড় স্নেহ-মায়া-মমতাশূন্য মনে হত তার। সর্বদা মনে হত মাথার উপর একটা অনিশ্চয়তার খাঁড়া ঝুলছে তার। সর্বনাশ! ছেলেটা কি তাহলে এই রকমই হবে নাকি! সোমা তো তাহলে ঠিকই করেছে। কিন্তু সোমার ক্ষমতা কতটুকু? কটা টাকা মাইনে পায় স্কুলে? ওই সম্বল নিয়ে সে ছেলেটাকে বড় করবে কি করে? মানুষ করবে কি করে? সোমা তাকে জীবন থেকে ছেঁটে দিয়েছে ঠিকই। ওদের দুজনের জীবন আর এ-জীবনে জুড়বে না এটা অরবিন্দ ধরেই নিয়েছে। তবু বরুণকে ও বিয়ে করবে এ তার কিছুতেই মনে হয় না। কেন মনে হয় না জানে না। তাছাড়া বিয়ে করলে এই ক'বছরের মধ্যে করেই ফেলত। অরবিন্দ সব ভাবতে পারে কিন্তু সোমা আবার বিয়ে করবে এ চিন্তা বরদাস্ত করতে পারে না। পারে না বলেই একবার বরুণকে দুশ টাকার বদলে ওই ছবি গছিয়ে সোমাকে সে-খবর জানিয়ে এসেছিল।

…কিন্তু বিয়ে না করলে সোমার থাকল কি? অনটন, দুশ্চিন্তা, ছেলের জন্য অনিশ্চয়তার হাহাকার। ছেলেটারও সেই দশাই হবে। সঙ্গতি না থাকলে তাই হয়ে থাকে। অরবিন্দর বাবা-মা যদি তার জন্য সে-রকম সঙ্গতির ব্যবস্থা রেখে যেত তাহলে কি তার এই দশা হত। অনিশ্চয়তার কাঁপুনি রোগে ধরত তাকে?

সেই ছেলেবেলার ব্যাধিটাই যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আবার নতুন করে ছেঁকে ধরল তাকে।

দিন কতকের মধ্যেই মনের তলায় আবার একটা সংকল্প দানা বেঁধে উঠতে লাগল তার। এই রোগে ধরলে যেমন হয় তেমনি বেপরোয়া সংকল্প কিছু। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আবার সেই পেট-মোটা ব্যাগে আর থলেতে ওষুধ ভরাট করে চারদিন পাঁচদিনের জন্য উধাও হয়ে যেতে লাগল। আর ফাঁক পেলে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজন পরিচিত অভিজ্ঞ দালালের কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

মাস দেড়েক পরের কথা। কি একটা ছুটি চলেছে। ছেলেকে সেই উপলক্ষে সোমা এখানে নিয়ে এসেছে টের পেয়েছে। দিন দুই পথে দেখেছেও। অরবিন্দর ছুটে গিয়ে তাকে আদর করতে ইচ্ছে করেছে। ছেলেকে আর সোমাকে দুজনকেই বলতে ইচ্ছে করেছে, কোনো ভাবনা নেই—সব ব্যবস্থা আমি করে ফেলব। চিন্তার রোগ বাধিয়ে কাজ নেই। কিন্তু সামনে যাবে কি তাকে দেখলেই ছেলের হাত ধরে সোমা কঠিন মুখে অন্যদিকে ফেরে।

এই দেড়-দু' মাসের অমানুষিক খাটুনিতে শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছে অরবিন্দর। সময়ে খাওয়া-দাওয়ার অভাবে গাল ভেঙেছে, চোয়ালের হাড় উঁচিয়ে উঠেছে।

এর মধ্যে পাড়ার বড় বাড়িতে একটা বিয়ে লেগে গেল। এ-সব ব্যাপারে অরবিন্দর মাতব্বরি একটা ধরা-বাঁধা ব্যাপার। বিয়ে বাড়ির লোকেরাই তাকে বলল—সব দিক দেখে-শুনে কাজ উতরে দিতে হবে। অরবিন্দ তাদের আশ্বাস দিয়েছে—কোনো ভাবনা নেই।

এদিকে যে ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে তিনি আবার সত্য হালদারের পরিচিত বন্ধু এবং মক্কেল। জ্যোতিষি করে এখনো উনি এঁর কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়ে থাকেন। এই মেয়ের জোটক বিচারও সত্য হালদার করেছেন। অতএব সোমাদেরও নেমন্তন্ন। বাপের তাগিদে সেজেগুঁজে ছেলের হাত ধরে যেতেই হল তাকে।

বিরাট প্যাণ্ডেলের নিচে সব খেতে বসানো হয়েছে। কিন্তু পরিবেশনের বালতি হাতে অরবিন্দ সেই থেকে এক কোণের একটা বিশেষ দিকেই আটকে আছে, যেখানে সোমা আর ছেলে খেতে বসেছে।

—মাছ দেব আর দুখানা ?

সোমা সরোষে মুখ তুলে তাকায়।

অরবিন্দ তাড়াতাড়ি ছেলের দিকে ফেরে। —তোকে দেব ? একসঙ্গে তিনটে মাছ ওই বাচ্চার পাতেই দিয়ে যায়।

—মাংস দেব আর একটু ?

আবার সেই উষ্ণ দৃষ্টি।

আবার সেই মাংসের থালা উপুড় হল ছেলের পাতে। অপচয় হচ্ছে সে-খেয়ালও নেই।

কিন্তু খেয়াল আর পাঁচজন করছে। কেউ কেউ হাসছে। অপচয় দেখে বিয়ে বাড়ির লোক গম্ভীর। আহাররত দুই-একজন টিপ্পনীও কাটল, আপনি যে পরিবেশনের বাসন হাতে ও দিকেই আটকে আছেন মশাই—আরো পাঁচজনের দিকে তাকান!

অরবিন্দর ভ্রূক্ষেপও নেই। সে হাসছে। সোমার মুখ লাল।

বেখাপ্পা গণ্ডগোল বেঁধে গেল একটু বাদেই।

—আর একটু দই দেব?

জবাবে সোমার সেইরকমই জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ। দই গিয়ে পড়ল ছেলের পাতে—যে পাতে একে একে সবই জমছে। সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক থেকে উষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপ।

ঠিক তখনই বিয়ে বাড়ির একজন অরবিন্দর হাত থেকে দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে নিল। অন্য হাতে তাকে ঠেলে সরাতে সরাতে বলল, আপনি এখন নিচে যান তো মশাই, খুব হয়েছে—আর পরিবেশন করতে হবে না।

রাগে চিড়বিড় করছে সোমা। অরবিন্দ হাসতে হাসতে চলে গেল।

ছেলের হাত ধরে নিচে নেমে কোথাও লোকটাকে দেখতে পেল না সোমা। ভেবেছিল, ঠিক ঘাপ্‌টি মেরে অপেক্ষা করছে। ছেলেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে এলো সে। মুখ না দেখে চলেই যেতে চায়।

কিন্তু খানিকটা এসে থমকে দাঁড়াতে হল। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঙা হাতে কি চিবুচ্ছে অরবিন্দ গাঙ্গুলি। ওই দোকানের মুড়ি ভালো—নিশ্চয় মুড়ি। ওদের দেখে হাসি মুখেই এগিয়ে এলো। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, পেট ভরেছে?

—খুব। বিয়ে বাড়ি থেকে এসে তুমি মুড়ি খাচ্ছ বাবা? ছেলে অবাক।

—মুড়ি খারাপ কি রে! সোমা, তুমি ওকে নরেন্দ্রপুরে পাঠিয়েছ—

ভালোই করেছ। ওর জন্য তোমাকে একটুও চিন্তা করতে হবে না, আমি ঠিক একটা ব্যবস্থা করব— বুঝলে !

এবারে সোজাসুজি অগ্নিদৃষ্টিতে তার মুখখানা একপ্রস্থ ভালো করে দগ্ধ করে সোমা ছেলেকে টেনে নিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগুলো।

ভিতরটা খচখচ করছে বলেই আরো রাগ তার। বিয়ে বাড়িতে মাছ-মাংস-চপ-কাটলেট দই-মিষ্টির ছড়াছড়ি—আর এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুড়ি চিবুনোর বরাত। এই বরাত ওদের জন্যেই মনে হতে আরো অসহ্য।

সংকল্প মতো ব্যবস্থাটা হয়ে উঠছে না বলেই ক্ষোভ আর অসহিষ্ণুতা বাড়ছে অরবিন্দ গাঙ্গুলির। কাল রাতেও ইনসিওরেন্সের সেই অভিজ্ঞ দালালের কাছ থেকে ঘুরে এসেছে। একই হিসেব বার বার দিতে হচ্ছে বলে সেই লোকটাও বিরক্ত তার ওপর।

মাত্র হাজার টাকা হয়েছে এই তিন মাসে। আর প্রায় হাজার দেড়েক চাই। ওষুধ বিক্রীর কাজে দিবারাত্র পরিশ্রম করে আর আধ-পেটে খেয়ে ওই টাকা জমিয়েছে। কিন্তু তার মতো মার্কামারা লোকের পক্ষে মোটামুটি ভালো ওষুধও সংগ্রহ করা মুশকিল হয়ে পড়েছে।

এভাবে হবে না। আর কোনো উপায় চাই—চাই-ই। এই চাওয়ার মধ্যে সততা-অসততার প্রশ্ন নেই।

যার যেমন ভাবনা তার তেমন সিদ্ধি। উপায় মাথায় এলো। মতলবটা নিজের অগোচরে বরুণ চক্রবর্তীই জোগান দিয়েছে। সোমার মন পাচ্ছে না বলে দিনকে দিন ভয়ানক মুষড়ে পড়ছে সে। একটা কিছু উপায় বাতলাবার কথা প্রায়ই বলছে তাকে।

মতলব অনুযায়ী দিন তিনেক ঘোরাঘুরি করল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। তারপর প্রস্তুত সে।

যার প্রতীক্ষায় ছিল সে এলো। মনের তাড়নায় প্রায়ই আসছে ইদানীং। বরুণ চক্রবর্তী।

বন্ধ দরজায় টোকা পড়তে অরবিন্দ আগে বাকস খুলে নিজের রোজগারের সেই হাজার টাকার গোছা বার করে চৌকিতে বসে গুনতে

শুরু করে সাড়া দিল, কে ?

—আমি বরুণ। ছুদিন ধরে দরজা ভেজানো দেখছে কেন সে বুঝতে পারে না। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে সে থমকে গেল। এক পাঁজা নোট গুনছে অরু।

এভাবে ঢুকে পড়ার ফলে অরবিন্দও যেন অপ্রস্তুত একটু। হেসে বলল, দেখে ফেললি তো! আয়—

—এত টাকা কিসের ?

—আমারই। অরবিন্দ নির্লিপ্ত।—এবার দিন ফিরবে মনে হয় ভাই, কাউকে কিছু বলিস না।

—ওষুধ বিক্রী করে পেয়েছিস ?

—ক্ষেপেছিস।

—তাহলে ?

জেরায় পড়ে অরবিন্দ যেন রেগেই গেল হঠাৎ।—সে খোঁজে তোর দরকার কি, তোর টাকার কোনো অভাব আছে ?

থতমত খেয়ে বরুণ বলল, না ভাই টাকার কোনো অভাব নেই। এক অভাবেই মারা পড়লাম—যা হোক একটা কিছু উপায় কর ভাই—আর পারি না।

টাকা গোনা বন্ধ করে অরবিন্দ ভুরু কুঁচকে খানিক চেয়ে রইল তার দিকে।—সোমার জন্য ?

—তা ছাড়া আর কি ? ওকে সামনে দেখলে আজকাল আমার হাড়-পাঁজরে কেমন একটা যন্ত্রণা শুরু হয়।

—বীণাকে দেখলে হয় না ?

—বীণাকে আর বেশি দেখছি কোথায়, সোমাকেই তো রোজ দেখছি।

—বিয়ের কথা বলিস না কেন ?

—ও মুখের দিকে তাকালে আমি কিছুই আর বলতে পারি না।

—তাহলে সোমাকে বিয়ে করে লাভ কি তোর ?

—কেন ?

—তেজী গোরুকে লাথি ছুঁড়তে দেখেছিস ?

—দেখেছি হয়তো, কেন ?

—বিয়ের পরেও তোর সেই দশা হবে, কাছে গেলে সাত হাত দূরে ঝেড়ে ফেলে দেবে। ওকে তো জানা আছে আমার।

—বলিস কি ! তাহলে··· ?

—তাহলে একমাত্র উপায় ওর মন বশ করা। ওর মনটাকে তোর দিকে ফিরিয়ে দিতে না পারলে বিয়ে করেও কোনো লাভ নেই।

—সে কি করে সম্ভব ?

—ছুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছু আছে আর আমি ভাবি না। দেখলাম তো নিজের চোখে।

—কি ? কি দেখলি ? বরুণ উন্মুখ।

অরবিন্দ গাঙ্গুলি ভ্রূকুটি করল।—এমন জ্বালাতন করিস, তোকে বলেই ফেললাম।

—কি-কিন্তু কিছুই তো বলিসনি !

অরবিন্দ ঝিম মেরে বসে রইল খানিক। তারপর ছু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো। শেষে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল।—তুই বন্ধু, তোকে বলেই ফেলি।···ছুনিয়ায় কত অঘটন আর কত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে খবর রাখিস ?

বরুণ মাথা নাড়ল। রাখে না।

—আমিও রাখতাম না। বরাতজোরে এক মহাপুরুষের সন্ধান পেয়ে গেলাম। সাক্ষাৎ দেবশক্তি তিনি।

—কোনো সাধুটাধু ?

অরবিন্দ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল।—ওই ভাষায় কথা বলিস কেন ? কপালে ছু'হাত ঠেকালো আবার—কৃপা পেলে বর্তে যাবি, ওই সোমা তখন আঠার মতো গায়ে সেঁটে থাকবে তোর। আর কৃপা করতে না চাইলে চেলা কাঠের পিটুনি খেয়েও পালিয়ে আসতে হতে পারে।

—ব-বলিস কি !

—তবে ? এই দেখ, আমার নিজেরই গায়ের চুল দাঁড়িয়ে গেছে। …কত বড় বড় হোমরা-চোমরা লোক গাড়ি হাঁকিয়ে সেখানে গিয়ে ধুলোয় লুটোপুটি খায় স্বচক্ষে দেখেছি। সাধু কাউকে মেরে তাড়াচ্ছেন, কাউকে অযাচিত করুণা করছেন। কতজনে টাকা-কড়ি সোনা-দানা ঢালছে উপুড় করে। সাধু ফিরেও তাকান না।

—তুই তার খবর পেলি কি করে ?

—বরাত রে ভাই, সবই বরাত। আমার জানাশোনা এক ওষুধের কারবারী, বয়েস কম করে ষাট—তার তৃতীয় পক্ষের বউ অন্য লোকের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াত—সেই মেয়েকে টিট করে ঘরে ফিরিয়ে দিলে ওই সাধু। বলেছিল ছেলে হবে—ষাট বছরের লোকটার সত্যি ছেলে হল। ভদ্রলোক আর তার সেই বউ সাধুর পুজো দিতে যাচ্ছিল, তাদের গাড়িতে আমিও উঠে বসলাম। তখনো কানাকড়িও বিশ্বাস করিনি আমি।

আমাকে দেখেই সাধু তেড়ে মারতে এলেন। বলে উঠলেন, তোর মতো পাষণ্ডকে মা আমার কাছে কেন পাঠাল ! আমার কি-যে হল কে জানে, দু'পা জড়িয়ে ধরে বললাম, হয় বিষ দাও নয়তো বাঁচার রাস্তা করে দাও।

সাধু গর্জন করে উঠলেন, তুই তো জুয়া খেলিস, তাতে কিছু হল না ?

বললাম, না বাবা, উল্টে সর্বস্বান্ত হয়েছি রেসে—বউয়ের গয়না গেছে, বউও গেছে।

সাধু বললেন তাহলে ফের রেসই খেলগে যা, ওমুক দিন অত নম্বর রেসের অত নম্বর ঘোড়া—মা যা নিয়েছে ওই রেসের হাত দিয়েই দশ বিশগুণ ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু একসঙ্গে বেশি লোভ করবি না, যে দিন যা বলব তাই করবি—যা ভাগ !

—তারপর ? তারপর ? বরুণ চক্রবর্তীর নিঃশ্বাস রুদ্ধ।

—তারপর আর কি। টাকাগুলো দেখালে।—তারপর এই—এক খেলাতেই হাজার টাকা। আবার সামনের মাসে যেতে বলেছেন।

কিন্তু সে টিপ কাউকে দিতে পারব না—তাহলে সর্বনাশ।

বরুণ চক্রবর্তী অস্থির হয়ে আবেদন জানালো, না ভাই, আমার ঘোড়ার টিপ চাইনে—আমাকে শুধু এই ব্যবস্থাটা করে দে।

অরবিন্দ টাকার বাণ্ডিল বালিশের নিচে রেখে চোখ বুজে ভেবে নিল একটু।—আমার তো ডেট এক মাস বাদে, আগে যেতে দেখলে ক্ষেপে যাবেন।

—আমার জন্যে তো যাচ্ছিস, নিজের জন্যে তো নয়।

—চল তাহলে কালই একবার, কি আছে অদৃষ্টে কে জানে! সেই আকন্দপুরের শ্মশান ছাড়িয়ে সাধুজীর ডেরা—দূর আছে।

পরদিন দুরু দুরু বুকে বরুণ চক্রবর্তী অরবিন্দর সঙ্গে সাধুর কাছে চলল। বেশির ভাগ পথই অরবিন্দ অতিমাত্রায় গম্ভীর। একবার শুধু বলল, নিজে থেকে তুই সাধুজীকে কিছু বলবি না।

দর্শন মিলল। ধুনী জ্বালিয়ে সাধুজী একলা বসে আছেন। অরবিন্দ ফিস ফিস করে বলল, বরাত ভালো মনে হচ্ছে, সাধুজী একলা আছেন।

তারা কাছে যেতেই আরক্ত চক্ষু মেলে তাকালেন সাধুজী। হুংকার দিয়ে উঠলেন, নিকালো হিঁয়াসে—নিকালো! সক্কলকে তাড়ালাম আবার তোরা এসেছিস? খুব লোভ—না?

তাঁর দু'পা জড়িয়ে ধরে অরবিন্দ বলল, নিজের জন্যে আসিনি বাবা—বন্ধুর জন্যে! ওকে দয়া করো।

বাবার আরক্ত চোখ এবার বরুণের দিকে। সেই চক্ষু দেখে বরুণের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

এবারে ডবল হুংকার ছাড়লেন সাধুজী।—ও পাপী! অন্যের বহুকে সাদী করতে চায়—তার প্রেম ভিখ মাগে—নিকালো হিঁয়াসে পাপী কাঁহাকা!

কাঁদ কাঁদ হয়ে বরুণ বলল, অন্যের বউ নয় বাবা—কোর্টে ছাড়াছাড়ি হবার পরে বিয়ে করব—বউ থাকতে নয়। অরু জানে—ওরই বউ!

জবাবে চণ্ডাল রাগে মাটি থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে সজোরে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলেন সাধুজী। ভয় পেয়ে বরুণ চোখ বুজে ফেলল। অবাক পরক্ষণে। তার মুখে এসে লাগল এক গাদা ফুলের পাঁপড়ি।

সাধুজী বলল, তুইও পাপী নস তাহলে—মা তোকেও দয়া করবেন বলে পাঠিয়েছেন। চিমটি কেটে দু' আঙুলে আবার খানিকটা ধুলো মাটি তুলে বললেন, হাঁ কর—

বরুণ হাঁ করল। তারপর আবার হতভম্ব। তার মুখে মাটি নয়, সন্দেশের গুঁড়ো।

বাবা চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন এবার। বেশ খানিকক্ষণ বাদে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, বশীকরণ!

বরুণ চমকে উঠল। অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, কি করতে হবে বাবা?

—বশীকরণ যজ্ঞ! অভিচারক্রিয়া! বশীকরণ যজ্ঞের ফোঁটা কপালে পরলে আর যজ্ঞের সহস্র ধাতুর মাদুলি ধারণ করলে ফুলের গন্ধে অলির মতোই প্রতিকূলা ভুজঙ্গিনী স্বরূপিণী রমণীও জাতকের দিকে আকৃষ্ট হবে, জাতকের মোহপাশে আবদ্ধ হবে! যা যা যা! দূর হ! দূর হ এখন। রাগত চোখে আরক্ত বাবা ত্রিশূল উঁচিয়ে ধরলেন এবার।

মাটি ছেড়ে বরুণ চক্রবর্তী সভয়ে দশ গজ দূরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু দেখল অরুটার সাহস বটে। ত্রিশূল উঁচানো সত্ত্বেও তার দু'পা আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকল। আর পায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে কি বলতে থাকল।

একটু বাদে আনন্দে হাসতে হাসতে আর কাঁদতে কাঁদতে উঠে এলো সে, বলল, তোর ভাগ্য ভালো, বাবা নিজেই যজ্ঞ করতে রাজি হয়েছেন—পরশু অমাবস্যার রাতেই যজ্ঞ হবে, তারপর কাণ্ডটা দেখিস।

বাড়ি ফিরে বাক্স খুলে অ্যালবাম থেকে সোমার আর একখানা

সেই রকম মাথা আঁচড়ানোর ছবি বার করে নিজে দেখল, বরুণকেও দেখালো। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সোমা এবার তোরই হয়ে গেল রে, আর কোনো বাধা থাকল না! ফুলের গন্ধে অলির মতো ও তোর সঙ্গেই লেগে থাকবে, এরপর তোর ইচ্ছেমতো উঠবে-বসবে ঘুরবে-ফিরবে হাসবে-কাঁদবে—

ফটোর ওপর চোখ রেখেই বরুণ বলল, কাঁদবে কেন—কাঁদবে না।

—তোকে দু'দণ্ড চোখে হারালেই কেঁদে আকুল হবে। রাত বারোটায় উঠে দেখবি ক্যানিং-এ তোর সঙ্গে মাছের ডাকের বাজারে গিয়ে হাজির হতে চাইবে।

ছবিটা নেবার জন্য হাত বাড়াল বরুণ। অরবিন্দ ধমকে উঠল, আবার একটা কেলেংকারি করবি? তাছাড়া যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংযম দরকার–সাধুবাবা ধ্যানে জানতে পারলে তোর মাথা উড়িয়ে দেবে—সহস্র ধাতুর যজ্ঞ ইয়ারকির ব্যাপার নাকি!

ফটো আবার স্যুটকেসে রেখে দিল সে।

যজ্ঞ হল। যজ্ঞের মাশুল হিসেবে বরুণ চক্রবর্তীর ব্যাঙ্ক থেকে দেড় হাজার টাকা খসে এসেছে।

অরবিন্দ তাকে যজ্ঞের বিভূতি এনে দিয়েছে আর সহস্র ধাতুর মাদুলি দিয়েছে। বলেছে, এক মাস ধরে রোজ চান করে উঠে যজ্ঞের ফোঁটা কপালে পরবি, আর মাদুলি ধোয়া জল খাবি। সাধু বলেছেন, একটা মাস পর্যন্ত রমণী সময় সময় উগ্র অথবা প্রতিকূল মূর্তি ধরতে পারে—তার জন্যে ভাবনা নেই, সেটা সুলক্ষণ।

বরুণের কাছ থেকে টাকা আদায়ের পর অরবিন্দ গাঙ্গুলি নিজের সংকল্প সাধনের কাজে লেগেছে। ইন্সিওরেন্সের সেই অভিজ্ঞ দালালের কাছে গেছে। চুপচাপ কাজ সেরেছে।

দিন কতক বাদে ডাকে তার নামে মস্ত রেজিষ্ট্রি খাম এসেছে একটা। জিনিসটা ভালো করে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেটা বাক্সে পুরেছে।

এর পর আবার সুযোগের প্রতীক্ষা। সোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তাকে দুচারটে কথা বলবে।···এখন বিশ্বাস করবে না হয়তো। কিন্তু পরে ঠিকই করবে। আত্মতুষ্টিতে মিটিমিটি হাসছে অরবিন্দ।···তাছাড়া বরুণের কথাও বলতে হবে। ভবিষ্যতের আশায় ছাই দিয়ে ওকে বীণাটার দিকেই টেনে নিয়ে যেতে হবে। এদিক থেকে বাতিল করে দিতে পারলে ও আপনি যাবে আর একদিকে।

স্কুল থেকে বাড়ির পথে একটা মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করছিল। দেখা হল। চোখে চোখ পড়ামাত্র সেই চিরাচরিত থমথমে মুখ সোমার। হাঁটার গতি দ্রুত হল।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে সঙ্গ নিল। গম্ভীর সেও। বলল আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে, তোমার শোনা দরকার। কখন সময় হবে?

জবাব না দিয়ে আরো জোরে হাঁটতে লাগল সোমা। এই লোকের সঙ্গে কথা কইতেও ঘেন্না, বিতৃষ্ণা। কিন্তু হেঁটে আর এই লোককে পিছনে ফেলবে কি করে। পাশ ঘেঁসে চলতে চলতে অরবিন্দ আবার বলল, সত্যি দরকারী কথা—বাড়ি আসব?

না! এক ঝলক আগুন বেরুলো সোমার গলা দিয়ে।

—তাহলে কখন সময় হবে?

—সময় হবে না!

—ঠিক আছে, তাহলে এখন যেতে যেতেই বলি।···সেদিন তোমাকে আমি বাজে কথা বলিনি, তোমার আর ছেলের ব্যবস্থা আমি করেছি। আজ থেকে এক বছরের মধ্যে কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি হাতে পাবে। এক বছরের মধ্যে নয়, এক বছর বাদে। ছেলেকে মানুষ করবে, তাকে আমার মতো অনিশ্চয়তার রোগে ভুগাতে দেবে না, আর নিজেও দুশ্চিন্তা করবে না।

গোড়ায় গোড়ায় এরকম শুনলে সোমার মন নরম হয়ে যেত। সেটা জেনেই আবার কোনো ফন্দি এঁটে এসেছে ধরে নিয়ে সোমা

ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পঞ্চাশ হাজার টাকা একসঙ্গে কখনো চোখে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল। একটি কথাও না বলে মুখ বুজে হনহন করে হেঁটে চলল সে।

অরবিন্দ আবার বলল, সেই টাকা হাতে এলে বরুণটাকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে দিও, ওই গাধাটাকে আর ঠকাতে চাই না। কিন্তু ছেলের দিব্যি এক বছরের আগে এসব কথা কাউকে বলবে না, বরুণকেও না।···ওটা একটা পয়লা নম্বরের গাধা, ওটাকে মিছিমিছি আটকে রেখেছ কেন? বীণার হাতে ছেড়ে দাও না!

এবারে সোমা ফুঁসে না উঠে পারল না। চাপা ঝাঁঝে বলল, তোমার তুলনায় স্বর্গ—তুমি শিগগীরই ডিভোর্সের নোটিস পাচ্ছ।

—ও···বেশ বেশ। নিজের স্বভাবে ফিরে এলো অরবিন্দ। বলল, ওর বশীকরণ যজ্ঞের ফল এরই মধ্যে মিলছে তাহলে। হাসছে।—ও এখন বশীকরণ যজ্ঞের ফোঁটা কপালে পরে আর গলায় বশীকরণের সহস্র ধাতুর মাতুলি পরে বেড়াচ্ছে লক্ষ্য করেছ? সাধুবাবা বলেছে, ফুলের গন্ধে অলির মতো তুমি ওর সঙ্গে আঁটকে যাবে এরপর থেকে। যাকে বলে বরুণ-পাগল হয়ে উঠবে একেবারে।···বেচারা সেদিন আমার কাছে তোমার সেই রকম বুক খোলা আর একখানা মাথা আঁচড়ানোর ছবি দেখে নেবার জন্য হ্যাংলার মতো হাত বাড়িয়েছিল—শ' পাঁচেক টাকায় ঝেড়ে দিতে পারতুম—ছেলের দিব্যি, একটাও মিথ্যে কথা বলছি না। হাসছে।—আমার তুলনায় স্বর্গ! জয় সাধুবাবার বশীকরণ! শুধু ছবি কেন, এবারে একদিন ডেকে সমস্ত নেগেটিভগুলোই দিয়ে দেব ওকে!

সহ্যেরও শেষ আছে। সোমা দাঁড়িয়ে গেল। দু'চোখ ধকধক করে জ্বলছে।

অরবিন্দও দাঁড়িয়ে গেল। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে আছে।

অরবিন্দর মুখের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে। চাউনিটা গভীর। গলার স্বরও। বলল, যাক, আগে যে কথাগুলো বললাম মনে রেখো।··· ছেলেটাকে দুশ্চিন্তার হাহাকারে পড়তে দিও না, নিজেও দুশ্চিন্তা

কোরো না।

রাস্তা আড়াআড়ি পেরিয়ে অন্য পথ ধরল সে। জ্বলন্ত চোখে সোমা চেয়েই রইল সেদিকে।

রাত্রি তখন আটটা হবে। অরবিন্দর ঘরে ফেরার নাম নেই। বীণার ওখানে বসে আছে আর আজে-বাজে কথা বলে সময় কাটাচ্ছে। ঘরে ফিরলেই দেখবে বরুণ অপেক্ষা করছে তার জন্যে। অরবিন্দর ধারণা সত্য হালদারের ভাষায় আজকের থেকেই তার রাহু-মঙ্গলের দশা শুরু হল। এই জন্যই এড়ানোর তাগিদ।

—অরু আছিস?

বাইরে থেকে করুণ ডাক ভেসে এলো। বীণা বলল, বরুণদার গলা মনে হচ্ছে!

অরবিন্দ মনে মনে তার উদ্দেশে একটা কটূক্তি করে নিয়ে দরাজ আহ্বান জানাল, আয়, ভিতরে আয়।

তার এই মূর্তির দিকে চেয়ে বীণা যথার্থ অবাক। ছোটখাট একটা ঝড় বয়ে গেছে যেন মানুষটার উপর দিয়ে। শুকনো বিবর্ণ মুখ, কেমন একটা দিশেহারা ভাব। জিজ্ঞেস না করে পারল না, আপনার শরীর খারাপ নাকি?

—না···। অরবিন্দর দিকে ফিরল, শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁটটা একবার ঘসে নিয়ে বলল, তোর সঙ্গে একটু দরকারী কথা ছিল—

—বোস। অরবিন্দ গম্ভীর।—বীণা, বরুণের জন্য কড়া করে এক পেয়ালা চা করো!

বীণা উঠে গেল। অরবিন্দ তার দিকে ফিরল। কপালে এখনো বশীকরণ বিভূতির কালো তিলক চকচক করছে। গলায় তাবিজ বাঁধা কালো সুতোটা দেখা যাচ্ছে।

—বল।

বিমর্ষ উৎকণ্ঠায় বরুণ ফিসফিস করে বলল, সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে আজ, কি হল বুঝছি না—তোর সঙ্গে সোমার দেখাটেখা হয়েছে নাকি?

—বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার সময় দু'মিনিটের জন্য দেখা হয়েছিল। আমাকে ডেকে জানিয়ে দিল, শিগগীরই ডিভোর্সের নোটিস পাঠাচ্ছে।

—অ্যাঁ! বরুণ অবাক।—তাহলে আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করল কেন! আমাকে দেখেই সোমা ক্ষেপে উঠল একেবারে—বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলল, এক রাশ ইংরেজি গালাগাল করে আমার দেওয়া ঘড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল!

—তুই কি করলি? অরবিন্দ তেমনি গম্ভীর।

—আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আরো ক্ষেপে উঠে ঘড়ি ফেরৎ দিতে পালিয়ে এলাম।

ভক্তিভরে দু'হাত কপালে ঠেকাল অরবিন্দ। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, জয় সাধুবাবা।

—কিন্তু এদিকে যে সত্যি সাংঘাতিক ব্যাপার!

—থাম্, ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। ঝাঁটা পেটা করেছে শুনলে আরো খুশী হতাম। সাধু বলেননি এটাই সুলক্ষণ? বলেননি, রমণী মাঝে মাঝে উগ্র হবে, প্রতিকূল মূর্তি ধরবে? নইলে একই দিনে আমাকে বলে ডিভোর্সের নোটিস নেবার জন্য প্রস্তুত থাকো! ওর মাথায় এখন সাংঘাতিক রিঅ্যাকশন শুরু হয়েছে বুঝছিস না?

বুঝতে চেষ্টা করে বরুণ বিভ্রান্তের মতো বসে রইল।

বীণা চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকল।

অরবিন্দ বলল, দে, চা দে। তারপরে বসে বরুণকে বেশ সুন্দর একখানা গান শোনা দেখি—।

॥ সাত ॥

এক বছরের মিয়াদের একটা ছক কেটেছিল অরবিন্দ গাঙ্গুলি। সেই ছক ধরে সংকল্পের শেষ মাথায় পৌঁছুতে পারবে ধরে নিয়েছিল। এর মধ্যে কোনো ভুল আছে বা ফাঁক আছে ভাবেনি।

কিন্তু ওপরঅলার ছকের খবর রাখে না। ওর জন্য তিনি আর এক ছক কেটে বসে আছেন। সেটার চেহারা আর এক রকম।

…প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব একটা জগতের মধ্যে গুটিশুটি মেরে বাস করছে। বাইরের জগতের ঝাপটা প্রতিনিয়ত এসে লাগছে সেখানে। তবু সব এড়িয়ে সে নিজেকে নিয়ে আছে, বাইরের ওই ঘাতপ্রতিঘাত সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন নয়।

শত-সহস্রজনের মতোই অরবিন্দ গাঙ্গুলিও এর ব্যতিক্রম নয়।

কলকাতার সর্বত্রই তখন বেশ একটা মারামারি কাটাকাটির মহড়া চলেছে। কিন্তু সেটা একটা সাময়িক উত্তেজনার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বেশি মূল্য দেবার সময় নেই কারো। কেবল. নাড়াটা যখন পড়ে মানুষ তখনই বিভ্রান্ত।

…এক মিনিটও নয়, মাত্র কটা মুহূর্তের মধ্যে যা ঘটে গেল, অরবিন্দ গাঙ্গুলির তার জন্য প্রস্তুতির অবকাশ ছিল না।

মোড়ের একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল। বেলা তখন চারটে। রাস্তায় লোক চলাচল খুব বেশি না হলেও একেবারে কমও নয়। মোড়ের মাঝখানে একটা পুলিস ডিউটিতে দাঁড়িয়ে আছে। খুব তৎপর হয়ে ডিউটি করছে এমন নয়। সেও যেন নিস্পৃহ মুখে জনতার চলাচলের ছবি দেখছে। তার কোমরের খাপে রিভলবার গোঁজা।

ব্যাপারটা আচমকা চোখে পড়ে গেল অরবিন্দর। চোখে পড়বে এটাই ভবিতব্য বোধহয়। তার হাত কয়েক দূরে দুটো ছেলে। বছর বাইশ-চব্বিশ বয়েস! নিরীহ মুখ। দু'জনেরই গায়ে পাতলা রঙিন চাদর জড়ানো। ছেলে দুটো একজন আর একজনকে চোখের ইশারা করল। সেটুকুই চোখে পড়ে গেল অরবিন্দ গাঙ্গুলির। তারপর পুলিসটার দিকে গুটি গুটি এগোতে লাগল ওরা।

সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে অরবিন্দর ভিতরে একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল যেন। অন্তরাত্মা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল। ওদিক ফেরা পুলিসটার দিকে তাকালো। কি হতে যাচ্ছে অরবিন্দ জানে।

কলকাতায় এরকম কাণ্ড অনেক ঘটেছে। ঘটছে। ছেলে দুটো পিছন থেকে পুলিসটার সামনে পৌঁছে গেছে প্রায়।

হাতের বিড়ি ফেলে দিশেহারার মতো অরবিন্দ গাঙ্গুলি সেদিকে ছুটল।

তবু একটু দেরি হয়ে গেল। একজনের ধারালো অস্ত্রের প্রথম আঘাতেই পুলিসটা মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতের জন্য হাত তুলতেই অরবিন্দ গাঙ্গুলি পিছন থেকে ছেলেটাকে জাপটে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল। ছেলেটার সঙ্গী পুলিসের কোমর থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নেবার তালে ছিল। অপ্রত্যাশিত বাধা পড়তে সচকিত।

পথের লোকজন মুহূর্তের মধ্যে দিশেহারা সন্ত্রস্ত।

অরবিন্দ আর সেই ছেলেটা তখনো জাপটা জাপটি করছে। চোখের পলকে উঠে এসে দ্বিতীয় ছেলেটা হাতের ধারালো অস্ত্র দিয়ে অরবিন্দর গায়ে পিঠে উপর্যুপরি তিন-চারবার প্রচণ্ড আঘাত করল। অরবিন্দ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারই ওপর দুজনে মিলে আরো দু-তিনটে ঘা বসিয়ে উন্মুক্ত অস্ত্র হাতে তীরের মতো সামনের গলির দিকে ছুটল।

পাড়ায়, এলাকায়, তারপর সমস্ত কলকাতায় খবরটা ছড়িয়ে গেল। রেডিওতে খবর ঘোষণা করা হল। সাধারণ একজন শুভবুদ্ধির মানুষ অসমসাহসে নিজের জীবন বিপন্ন করে একটি পুলিসের প্রাণরক্ষা করেছে।

সেই সাধারণ শুভবুদ্ধির মানুষের নাম অরবিন্দ গাঙ্গুলি। সে হাসপাতালে আছে। পুলিসের আঘাত সামান্য, কিন্তু অরবিন্দ গাঙ্গুলির মুমূর্ষু অবস্থা। মিনিস্টাররা এবং রাজ্য সরকারের পদস্থ ব্যক্তিরা অনেকেই হাসপাতালে ছুটে গেছেন তাকে দেখতে।

ঘটনাটাকে শুভবুদ্ধির একটা শাদা নজির বলে ঘোষণা করছেন অনেকে।

নব-কলোনী উত্তেজনায় টইটম্বুর। অনেকেই হাসপাতালে ছোটা-

ছুটি করছে। খবর নিয়ে আসছে। কিন্তু কেউ ঢুকতে পাচ্ছে না। কেউ অরবিন্দ গাঙ্গুলিকে এক-নজর দেখে আসতে পারছে না। পুলিস যেতে দিচ্ছে না তাদের।

বরুণ চক্রবর্তীও ছুটে গেছল। দুঘণ্টা অপেক্ষা করে সেও ফিরে এসেছে। শুধু খবর জেনেছে, অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।

সোমা এতবার করে ঘর বার করছে কেন নিজেও জানে না।

বাবা গালে হাত দিয়ে তার বাইরের ঘরে বসে আছে। সোমা সেখানেও এসে দাঁড়াচ্ছে এক-একবার। আবার ভিতরে চলে যাচ্ছে। পাড়ার অনেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে এসেছে। স্ত্রীকে নিশ্চয় ঢুকতে দেওয়া হবে। সোমা মাথা নেড়েছে। যাবে না।

…কেন যাবে? কে স্ত্রী? সোমা তো অনেক দিনই তার কপালের সিঁদুর, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছে। এখন কাকে দেখতে যাবে? কি দেখতে যাবে?

অন্যমনস্ক হঠাৎ। রাস্তায় সেদিনের গম্ভীর কথাগুলো মনে পড়ছে। বলেছিল, ছেলেটাকে মানুষ কোরো, তাকে দুশ্চিন্তার হাহাকারে পড়তে দিও না, আর নিজেও দুশ্চিন্তা কোরো না।

…আর বলেছিল, এক বছরের মধ্যে কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা সোমা হাতে পাবে। বলেছিল, তোমার আর ছেলের ব্যবস্থা আমি করেছি।

কেন বলেছিল? সরকার নাকি এর মধ্যে কি একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছে কানে এসেছে। আগে থাকতে ওকে নিশ্চিন্ত করতে চাইল কি করে? সব কি সাজানো ব্যাপার নাকি?

সোমা কিছুই বলতে চায় না, কিছুই ভাবতে চায় না। কিন্তু ছটফটানি বাড়ছেই—বাড়ছেই তার।

ট্র্যানজিস্টার হাতে বরুণ চক্রবর্তী এলো। আজ আর তাকে বকে তাড়াতে পারল না সোমা। তার মুখখানা ভয়ানক শুকনো দেখছে। চোখে-মুখে আর্ত ছাপ।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় রেডিওতে নাকি আহত আত্মত্যাগী মানুষটার খবর জানানো হচ্ছে।

…রাত নটায় আবার একটা ঘোষণা ভেসে এলো। শুরুর আগেই সোমা বিষম চমকে উঠল।

…রোগীর অবস্থা এখনো গুরুতর। কিন্তু এরই মধ্যে তার জ্ঞান ফিরেছিল। এরই মধ্যে কথা বলেছিল। অরবিন্দ গাঙ্গুলি নাকি বলেছে, সে কোনো মহৎ কাজ করার জন্য ওভাবে ছুটে যায়নি। তার নিজের একটা রোগের তাড়নায় ওভাবে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ছেলে ছুটোর উদ্দেশ্য বোঝা মাত্র সে পুলিসটার দিকে তাকিয়েছে। তক্ষুনি সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তাকে ঘিরে তার পরিবার আর ছেলেমেয়েরা হাহাকার করে কাঁদছে—এরপর কি হবে তাদের সেই অনিশ্চয়তার হাহাকার। কল্পনায় সেই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়ে পারেনি।

বেতারে আরো বলছে, বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক একযোগে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন এই মহৎ মানুষটাকে জীবনের পথে নিয়ে আসতে। রোগীর প্রাণশক্তি অপরিসীম—এটুকুই তাদের আশা।

…বরুণ উঠে চলে গেছে একসময়। ট্র্যানজিস্টারটা রেখে গেছে। কিন্তু ওটা বন্ধ আছে।

…রাত বাড়ছে। সোমা বিছানায় গা ঠেকাতে পারছে না। উঠছে, বসছে, শুচ্ছে।

…এক বুড়ীর নাতনির বিয়েতে আড়াই হাজার টাকা দিয়েছিল। দিয়ে ওই মেয়ের মাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। বুড়ী সোমাকে আদর করে বলেছিল. তোমার জন্ম-জন্মের ভাগ্যি গো মা এমন ভোলানাথ পেয়েছ—ও যতো দেবে তোমার ছু' হাত ততো ভরে উঠবে।

ওই রোগের তাড়নায় আড়াই হাজার টাকা দিয়েছে। ওই রোগের তাড়নায় গয়না চুরি করে বীণার মায়ের শেষ চিকিৎসা করেছে। ওই রোগের তাড়নায় মিথ্যে বলে চাকরি নিয়েছে। ওই রোগের

তাড়নায় অনেক—অনেক কিছু করেছে।

···একের পর এক মিথ্যে ধরা পড়েছে। চাকরি মিথ্যে, ন'শ টাকা মাইনে মিথ্যে, এম. এসসি পাশ মিথ্যে, বরুণ চক্রবর্তীর বি. এ ফেল মিথ্যে। কিন্তু সব মিথ্যে ধরা পড়ার পরেও আগাগোড়া সোমাকে এক কথাই বলেছে, তোমার জন্যে—সব তোমার জন্যে করেছি। নইলে তোমাকে পেতাম না।

সকলের দ্বিগুণ ঘৃণা করেছে সোমা তখন তাকে। সে শুধু বলত, তুমি ঘৃণা কোরো না, তুমি শুধু সদয় থেকো। কিন্তু সোমা শুধু ঘৃণাই করেছে।

ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল। ও হাসপাতালে যাচ্ছে রোগী দেখতে। সঙ্গে ছেলেও আছে। ছেলেকে সোমা নরেন্দ্রপুর থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের কাছে রেখেছে। রোগীর অবস্থা ভালোর দিকে। ছেলেকে দেখে মানুষটা অবাক। জিজ্ঞাসা করল, নরেন্দ্রপুর থেকে ওকে নিয়ে এলে নাকি?

সোমা বলল, হ্যাঁ নিজের কাছেই রাখব।

সে বলল, নিজের কাছে রাখলে ও মানুষ হবে কি করে? আমার মতো হয়ে বসলে?

সোমা বলল, তোমার মতো যাতে হয় সেই জন্যেই নিয়ে এলাম।

ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে ভোরের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

সোমা উঠল। বাবাকে চা করে দিল। তিনিও আগে থাকতে উঠে বসে আছেন। কারো মুখে কথা নেই।

উদগ্রীব প্রতীক্ষায় আছে সোমা। ঘড়ি দেখে ট্র্যানজিস্টার খুলল। খবরের প্রথমেই রোগীর প্রসঙ্গ।···রাতটা নির্বিঘ্নে কেটেছে। অবস্থা একরকমই। চিকিৎসকরা যুঝছেন! রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে এইটুকুই ভরসার কথা।

সোমা ট্র্যানজিস্টার বন্ধ করে স্নান সেরে নিল। বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখে বীণা ভট্‌চায্ বসে আছে উৎকণ্ঠিত মুখে। তার হাতে মস্ত খাম একটা।

ওকে দেখেই বীণা বলে উঠল, বউদি গো, তুমি এখনো গেলে না অরুদাকে দেখতে, এখনো মানুষটাকে চিনলে না তুমি? এখনো রাগ তোমার?

সোমা চেয়ে আছে তার দিকে।

কান্না সামলে বীণা বলল, কাল সমস্ত রাত আমি হাসপাতালে পড়েছিলাম। সেখানে লোকে-লোকারণ্য। আত্মীয় শুনে আমাকে ভোর রাতে দেখা করতে দিল। অরুদার সঙ্গে দেখা হল, কথা হল—

সোমা চেয়েই আছে।

কান্নায় ভেঙে হাতের খাম থেকে মস্ত একটা কাগজ বার করে বীণা বলল, এই দেখো—তোমার জন্য অরুদা কি সাংঘাতিক মতলব এঁটে বসেছিল। এটা পঞ্চাশ হাজার টাকার ইনসিওরেন্সের পলিসি—তুমি এর নমিনি। এক বছরের একটা প্রিমিয়াম একবারে দিয়ে রেখেছে। এক বছর বাদে আত্মহত্যা করলেও ইনসিওরেন্সের পুরো টাকা পাওয়া যায় জেনে এই কাণ্ড করে রেখেছে। এক বছর পার হলেই আত্মহত্যা করে এ-টাকা তোমাকে পাইয়ে দিত। অরুদা আমাকে বলল, ভগবান আমাকে এ পাপ থেকে রক্ষা করল, এক বছরের ঢের আগেই সোমা এ-টাকা পেয়ে যাবে—পলিসিটা আমার বাক্স থেকে বার করে নিয়ে আজই সোমার হাতে দিবি। আর তাকে ছেলের জন্য বা নিজের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

সোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক কেঁপে উঠল থর থর করে। তারপর স্থির আবার। এখন সে বুঝতে পারছে—সব বুঝতে পারছে। একটা কান্নার সমুদ্র বুক ঠেলে চোখের দিকে ধেয়ে আসছে তার। কিন্তু চোখের পথ ধরে সে-কান্না মুক্তি পাচ্ছে না।

সোমা বীণার দিকেই চেয়ে আছে।

—তুমি এখনো দেখছ কি দাঁড়িয়ে বউদি? যাবে না? আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব বলে এলাম।

ভোর রাতের সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ল সোমার হঠাৎ। আর একদিনও বিভীষিকার স্বপ্ন দেখেছিল একটা। কিন্তু ওটা বিকৃতি

ছাড়া আর কিছু নয়। আজকের স্বপ্ন তার থেকে ঢের বেশি সত্য, তার থেকে ঢের বেশি জোর এর। দেহের ভিতরে বিপরীত শিহরণ আবার একটা।···কিছু হতে পারে না, আর কোনো অঘটনই ঘটতে পারে না। পারে না—পারে না—পারে না।

সোমা বলল, যাব, একটু অপেক্ষা করো। কেঁদ না। ভয় পেও না।

তার হাত থেকে খামসুদ্ধ পলিসিটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ওটা বিছানার ওপরেই ফেলে রাখল। এক মিনিটের মধ্যে শাড়িটা ঠিক করে পরে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি মাথাটা আঁচড়ে নিল।

বীণা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

চিরুনি রেখে দেরাজ থেকে সিঁদুর কৌটো বার করল সোমা। এবারে আর তাড়াহুড়ো করল না। পরিপাটি করে কপালে সিঁদুরের টিপ পরল। সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর ঘসে দিল। প্রসন্ন কমনীয় মুখ।

সিঁদুর পরতে পরতে আয়নায় নিজেকেই দেখছে সোমা।

স্বপ্ন মিথ্যে হবে না। আজই বিকেলের মধ্যে নরেন্দ্রপুর গিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসবে।

···ছেলেকে দেখে মানুষটা অবাক হবে। জিজ্ঞাসা করবে, নরেন্দ্রপুর থেকে ওকে নিয়ে এলে নাকি?

···সোমা বলবে, হ্যাঁ নিজের কাছেই রাখব।

···সে বলবে, নিজের কাছে রাখলে ও মানুষ হবে কি করে? আমার মতো হয়ে বসলে?

সোমা বলবে, তোমার মতো যাতে হয় সেই জন্যেই নিয়ে এলাম।